اشراق

Ishraq USA | Bangla Edition

ইশরাক বাংলা সংস্করণ। জুন ২০২৫

আল-ইশরাক

বাংলা

সম্পাদক: মাওলানা উমর ফারুক

সম্পাদনা পরিষদ:

মঞ্জুর এলাহী

হুমায়ুন কবির

মোহাম্মদ সিয়াম হোসেন

ইমদাদ হোসেন

www.ghamidi.org

Ishraq USA | Bangla Edition

ইশরাক বাংলা সংস্করণ । জুন ২০২৫

আল-ইশরাক
বাংলা

সূচিপত্র

১) আল-বায়ান: প্রথম অধ্যায় ৩

২) মিজান: কুরআন অধ্যয়নের মূলনীতি ৬

৩) ইসলামি রাজনীতি ও কুরআনের আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা ১১

৪) কুরবানির লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও বিধি-বিধান ২৪

৫) খিলাফত ব্যবস্থা ২৭

৬) ইমাম বুখারির গ্রন্থ : ওহি নাকি ইতিহাস? ৩২

৭) ইতমামে হুজ্জাত ৩৬

৮) গজল ৪২

Ghamidi Center of Islamic Learning
www.ghamidi.org
AN INITIATIVE OF AL-MAWRID US.

আল-বায়ান: প্রথম অধ্যায়

জাভেদ আহমেদ গামিদি

এটা কুরআন মাজিদের প্রথম অধ্যায়। এতে ‘আল-ফাতিহা (الفاتحة)’ থেকে ‘আল-মায়িদা (المائدة)’ পর্যন্ত মোট পাঁচটি সুরা রয়েছে। সুরাগুলোর বিষয়বস্তু এটা থেকে স্পষ্ট হয় যে, প্রথম সুরা – ‘আল-ফাতিহা (الفاتحة)’ নাযিল হয়েছে উম্মুল কুরা [নামে সমধিক পরিচিত শহর] মক্কাতে এবং অবশিষ্ট চারটি সুরা – ‘আল-বাকারা (البقرة)’, ‘আলে-ইমরান (آل عمران)’, ‘আন-নিসা (النساء)’, ‘আল-মায়িদা (المائدة)’ হিজরতের পরে মদিনাতে নাযিল হয়েছে।

কুরআন মাজিদের অন্যসব অধ্যায়ের মতো এই অধ্যায়টিও একটি মাক্কি সুরা দিয়ে আরম্ভ হয়ে মাদানি সুরাতে গিয়ে শেষ হয়েছে। বিষয়বস্তুর দিক থেকে এই অধ্যায়ের সুরাগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক – দোয়া ও দোয়ার জবাব দেয়া এবং বিষয়বস্তুকে সংক্ষিপ্ত ও বিশদভাবে তুলে ধরার মাঝে নিহিত। সুরা ফাতিহাতে হ্যাঁ ও না-সূচকের মধ্যস্থতায় যেরূপ সংক্ষিপ্তভাবে আমরা দোয়া করি, ঠিক তার পরপরই মাদানি সুরাগুলোতে সেগুলোর বিশদ বিবরণ প্রদান করা হয়েছে।

এই অধ্যায়ে সাধারণভাবে যদিও নবী (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ) এবং মদিনার মুশরিকদের উদ্দেশ্য করে বক্তব্য প্রদান হয়েছে, কিন্তু একটু গভীর গিয়ে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, সাইয়্যেদেনা ইব্রাহিম (عليه السلام)-এর বংশধরেরাই এই অধ্যায়ের মূল শ্রোতা। মূলত, আদম সন্তানদের মধ্য থেকে আল্লাহ তায়ালা যেভাবে কিছু ব্যক্তিকে নবুয়ত ও রিসালাতের জন্য মনোনীত করেছেন, ঠিক তেমনি তিনি ইব্রাহিম (عليه السلام)-এর বংশধরদেরকে বিশ্ববাসীর উপর ইতমামে হুজ্জাতের কাজটি সম্পন্ন করতে মনোনীত করেছেন।

এই অধ্যায়ের বিষয়বস্তু ইহুদি ও খ্রিস্টানদের উপর ইতমামে হুজ্জাত সম্পন্ন করা এবং এই দুটো উম্মতের স্থলে ইব্রাহিমি বংশের অপর শাখা বনি ইসমাইল হতে মুসলিম উম্মতের ভিত প্রতিষ্ঠা করা এবং তাদের পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করা। এর পাশাপাশি এই উম্মতের সাথে সম্পন্ন হওয়া খোদা তায়ালার শেষ চুক্তিনামার বিবরণ তুলে ধরা।

এই বিষয়বস্তুটি এই অধ্যায়ের শুরু থেকে একেবারে শেষ পর্যন্ত এত চমৎকার ও নান্দনিক ভঙ্গিমায় সামনে এগিয়েছে যে, তাওরাত ও ইনজিলের পর নতুন হেদায়েতের প্রয়োজনীয়তা, ঐ হেদায়েত মোতাবেক মুসলিম উম্মতের ভিত প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে এই উম্মতের জন্য দ্বীনকে পরিপূর্ণ করা এবং একইসাথে খোদা তায়ালার নিয়ামতকে পূর্ণ করা পর্যন্ত যত ধাপ ও মনজিল রয়েছে, তার সবক'টি দৃশ্যপট দারুণভাবে তুলে ধরেছে।

এই বিন্যাসকে বুঝার জন্য এর সারমর্ম আমরা নিম্নে তুলে ধরছি:

আল-ফাতিহা (الفاتحة) : নতুন হেদায়েতের দোয়া

আল-বাকারা (البقرة) : নতুন এই হেদায়েতের ব্যাপারে ইহুদিদের আচরণ, তাদের উপর ইতমামে হুজ্জাত সম্পন্ন করা এবং তাদের স্থলে ইব্রাহিমি বংশের অপর শাখা বনি ইসমাইল হতে মুসলিম উম্মতের ভিত প্রতিষ্ঠা এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় বিষয়াদির বিবরণ তুলে ধরা।

আলে-ইমরান (آل عمران) : ইহুদি ও খ্রিস্টানদের উপর ইতমামে হুজ্জাত সম্পন্ন করা এবং মুসলিম উম্মতকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করা।

আন-নিসা (النساء) : মুসলিম উম্মতের জন্য নেককার সমাজের ভিত প্রতিষ্ঠা এবং সেটার সাথে সংশ্লিষ্ট পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধির বয়ান।

আল-মায়িদা (المائدة) : মুসলিম উম্মতের জন্য খোদা তায়ালার নিয়ামতকে পূর্ণ করা এবং জগতের প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালা ও তাদের মধ্যে সম্পন্ন হওয়া শেষ চুক্তিনামার বিবরণ।

اَلْفَاتِحَةُ
আল-ফাতিহা

স্বীয় বিষয়বস্তুর আলোকে, এই সুরাটি মহাবিশ্বের প্রভু খোদা তায়ালার দরবারে হাজির হয়ে ঐ সরল পথের দিশা লাভের দোয়া – যা ছিল নবুয়তের জামানার সুস্থ প্রকৃতি ও বিবেকসম্পন্ন প্রতিটি মানুষের পরম আকাঙ্ক্ষা।ইহুদি ও খ্রিস্টানরা নিজেদের বক্রতা ও পথভ্রষ্টতা দ্বারা যেভাবে দ্বীনের চেহারা বিকৃত করেছে, তাতে এই পথের হেদায়েত পরিণত হয় প্রতিটি অন্তরের ফরিয়াদে।আল্লাহ তায়ালা প্রতিটি অন্তরের এই ফরিয়াদকে এই সুরাতে শব্দের এমন গাঁথুনি দিয়ে তাঁর প্রেরিত নবীর কণ্ঠে জারি করেছেন – যার দ্বিতীয় কোন নজির নেই এবং যা কালোত্তীর্ণ।

তাওরাত ও ইনজিলের পর আসমান থেকে নতুন এক হেদায়েত লাভের দোয়া-ই হচ্ছে এই সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়।কুরআনের প্রথম অধ্যায়ের মাদানি সুরাগুলোর সাথে এই সুরার যে সম্পর্ক, যা আমরা ইতোমধ্যে অধ্যায়টির পরিচিতি পর্বে তুলে ধরেছি, অর্থাৎ বিষয়বস্তুকে সংক্ষিপ্ত ও বিশদভাবে তুলে ধরা – এটা ছাড়াও এই বিষয়ের আলোকে এই সুরাটি কুরআনের নিহায়েৎ একটি ভারসাম্যপূর্ণ মুখবন্ধ বা ভূমিকাও বটে।

এই বিবেচনায় এটা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট যে, কুরআনের প্রথম সুরা – ফাতিহা, যা উম্মুল কুরা নামে পরিচিত মক্কাতে রাসুল (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ)-কে রিসালাতের দায়িত্ব প্রদানের পর তার উপর নাযিল করা হয়েছিল।

[চলবে]

মিজান: কুরআন অধ্যয়নের মূলনীতি

জাভেদ আহমেদ গামিদি

প্রথমে ঐসব বুনিয়াদী বিষয়ের আলোচনা হবে, যা কুরআন মাজিদ উপলব্ধিতে বিবেচনায় রাখা আবশ্যক:

উচ্চ আলংকারিক আরবি

প্রথম বিষয় হচ্ছে, কুরআন মাজিদ যে ভাষায় নাযিল হয়েছে, তা উম্মুল কুরা [বা মক্কার] উচ্চ অলংকারের আরবি, যে ভাষায় জাহেলী যুগের কুরাইশ গোত্রের লোকেরা কথা বলতো।এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর এ গ্রন্থের ভাষাকে অলংকার ও বাগ্মিতার এক চিরন্তন মুজেজা বানিয়েছেন, তথাপি নিজের উৎসমূলের দিক থেকে এটা সেই ভাষা, যাতে কথা বলেছেন স্রষ্টার প্রেরিত নবী এবং এটা ছিল তৎকালীন মক্কাবাসীর ভাষা।

فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُّدًّا۔

“আর (হে নবী) আমরা এ কুরআনকে আপনার ভাষায় এজন্য সহজ ও প্রাঞ্জল করেছি, যেন এর মাধ্যমে আপনি আল্লাহর ভয়ে ভীত লোকদের সুসংবাদ দিতে পারেন এবং এর মাধ্যমে হঠকারী স্বভাবের লোকদের হুশিয়ার করতে পারেন।” (মারইয়াম ১৯:৯৭)

এ কারণে কুরআনের উপলব্ধি এ ভাষার সঠিক জ্ঞান, যথাযথ মেজাজ ও ভাষারুচির উপর নির্ভরশীল।কুরআনের গভীর উপলব্ধি এবং এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের জন্য আবশ্যক যে, ব্যক্তি এ ভাষার পাকাপোক্ত পণ্ডিত হবেন এবং নিজের মধ্যে আরবি ভাষারীতির এমন অন্তরঙ্গ মেজাজ ও রুচি তৈরি করবেন যে, অন্ততপক্ষে ভাষার দিক দিয়ে কুরআনের উদ্দেশ্য উপলব্ধির ক্ষেত্রে তিনি কোনো প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হবেন না।

এ বাস্তবতা অধিক ব্যাখ্যার মুখাপেক্ষী নয়।উপরন্তু, এ ভাষার ক্ষেত্রে প্রত্যেক জ্ঞানান্বেষী এটা স্পষ্টভাবে বুঝে নিতে হবে যে, এটা না হারিরি-মুতানাব্বি বা যামাখশারি-রাযি'র লেখা আরবি; আর না এটা বর্তমান মিশর-সিরিয়ার পত্র-পত্রিকা এবং এই এলাকাগুলোর সাহিত্যিক ও কবিদের কলমে লিখিত আরবি। এগুলো এক ধরনের আরবি বটে; তবে কুরআন যে আরবিতে নাযিল হয়েছে, যেটাকে আরবিয়ে মুআল্লা [উচ্চ আলংকারিক আরবি] বলা শ্রেয় – সেটার সাথে ভাষারীতি, গঠন, শব্দ ও বাগধারার দিক থেকে এ আরবির সাথে কম-বেশি যে পার্থক্য রয়েছে, তার উপমা: মির-গালিব এবং সাদি-খাইয়্যামে'র ভাষার সাথে আমাদের বর্তমান হিন্দুস্তান ও ইরানের সংবাদপত্র ও সাময়িকীতে প্রকাশিত উর্দু ও ফারসির মধ্যকার পার্থক্য।বাস্তবতা হচ্ছে: [আধুনিক ও মধ্যযুগীয়] এ আরবি কুরআনের ভাষার প্রতি আপনার কোনো রুচি তৈরি করে না, বরং তা ঐ রুচি সৃষ্টিতে প্রতিবন্ধক।যিনি এই আরবিতে মনোনিবেশ করবেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনি কুরআনের উপলব্ধি থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত হবেন।

ফলশ্রুতিতে কুরআনের ভাষার জন্য সর্বাগ্রে যে জিনিসের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে, তা স্বয়ং কুরআন মাজিদ।এ বাস্তবতা কেউই অস্বীকার করতে পারবে না যে, কুরআন যখন মক্কায় নাযিল হচ্ছিল, তখন এর ঐশ্বরিক মর্যাদা নিয়ে লম্বা একটা সময় বিতর্ক চললেও এর আরবি নিয়ে কেউ কখনো কোনো চ্যালেঞ্জ জানাতে পারেনি।এজন্য বলা হয়: কুরআন কোনো অনারব লোকের কাজ হতে পারে না এবং এই দলীল দেয়া হয় যে, এটা নাযিল হয়েছে সর্বোত্তম প্রাঞ্জল আরবীতে।ভাষা ও সাহিত্য এবং অলংকার ও বাগ্মিতার এক মুজেজায় নিজেকে পরিণত করার পাশাপাশি কুরআন কুরাইশদের উদ্দেশ্যে এটার অনুরূপ একটি সুরা বানানোর চ্যালেঞ্জ জানায়।এমনকি প্রকাশ্যে ঘোষণা করে: এ কাজে সহায়তার জন্য তারা তাদের সাহিত্যিক, বক্তা, কবি, গণকসহ কেবল মানুষ নয়, বরং চাইলে জীন, শয়তান ও দেব-দেবীদের মধ্য থেকে যে কাউকে শামিল করতে পারবে।

কিন্তু এটা অনস্বীকার্য ঐতিহাসিক বাস্তবতা যে, আরবদের কেউ না পেরেছে কুরআনের আরবির শান-শওকতকে প্রত্যাখ্যান করতে, আর না কারো পক্ষে এর ছুড়ে দেয়া চ্যালেঞ্জের জবাব দেয়া সম্ভব হয়েছে।

وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ
وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔

“(এটা এ গ্রন্থের আহ্বান, তাই এ আহ্বানে সাড়া দাও), আর যা কিছু আমরা আমাদের বান্দার উপর নাযিল করেছি, তার ব্যাপারে তোমরা যদি সন্দেহে থাকো (তাহলে যাও) এবং এর মতো একটি সুরা বানাও, আর (এ জন্যে) আল্লাহ ছাড়া তোমাদের যত সহযোগী আছে, তাদের ডাকো, যদি (তোমরা তোমাদের এ ধারণায়) সত্যবাদী হও।” (বাকারা, ২:২৩)

قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ
لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔

“বলে দাও: আর যদি গোটা মানব ও জীনজাতি একত্র হয়ে বানাতে চায় এই কুরআনের অনুরূপ কিছু, তবে এ কুরআনের অনুরূপ কিছুই তারা নিয়ে আসতে পারবে না – এমনকি তারা যদি পরস্পরের সহযোগী পর্যন্ত হয়।” (বনি ইসরাইল, ১৭:৮৮)

এখানেই শেষ নয়, উম্মুল কুরা [মক্কা]-’র ওলিদ ইবনে মুগিরার ন্যায় সাহিত্য সমালোচক পর্যন্ত কুরআনের ভাষা শুনে স্বতস্ফূর্তভাবে বলে উঠে:

والله ، ما منكم رجل أعرف بالأشعار مني ، ولا أعلم برجزه ولا بقصيده
مني ، ولا بأشعار الجن۔ والله ، ما يشبه الذي يقول شيءًا من هذا۔ والله ،
إن لقوله الذي يقوله حلاوة وإن عليه لطلاوة ، وإنه لمثمر أعلاه ، مغدق
أسفله ، وإنه ليعلو ولا يعلى ، وإنه ليحطم ما تحته۔

“আল্লাহর কসম, তোমাদের মধ্য থেকে কেউই আমার থেকে কবিতা সম্পর্কে বেশি জ্ঞান রাখে না – সেটা রণ-সংগীত, স্তুতি কাব্যই হোক, আর সেটা জীনদের দ্বারা অনুপ্রাণিত মন্ত্রই হোক।আল্লাহর কসম, এই ব্যক্তির কণ্ঠে যা ধ্বণিত হচ্ছে, তার কিছুই এগুলোর সাথে সাদৃশ্য রাখে না। আল্লাহর কসম, এই লোকের বলা বাণীগুলো বেশ সুমিষ্ট ও বড়ই চমকপ্রদ। এর শাখা ফল-ফলাদিতে ভারী, আর শিকড় বেশ তরতাজা। এর বিজয় সুনিশ্চিত, পরাস্ত হওয়ার প্রশ্নই উঠে না।অন্যদিকে এর চেয়ে নিম্নতর সবই এর দ্বারা ধূলিস্মাৎ হবে।” (আস-সিরাতুন নববিয়্যাহ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪৯৯)

সাবআ’ মুয়াল্লাকাতের অন্যতম কবি লাবিদ ঐ সময় জীবিত ছিলেন।লাবিদ এমনই উঁচু মাপের কবি ছিলেন যে, ফারাযদাকের মতো খ্যাতনামা কবিও তার একটি পংক্তির সামনে মাথা নত করেছিল। সেই লাবিদ কুরআনের ভাষা দ্বারা এতটাই বাকরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন যে, যখন সায়্যিদিনা উমর ফারুক তার কাছে কবিতা শোনার অনুরোধ জানান, তখন তিনি বলে উঠেন: [আল্লাহ আমাকে শিখিয়েছেন বাকারা ও আলে-ইমরান, এরপর আমি আর কী কবিতা বলবো] – ‘ما كنت لأقول شعرًا بعد أن علمني اللّٰه البقرة وآل عمران’।

এটা কেবল এক ব্যক্তির স্বীকারোক্তি নয়; বরং এর তাৎপর্য হচ্ছে: গোটা আরবের অলংকার ও বাগ্মিতা পরাজয় বরণ করেছে কুরআনের ভাষার সামনে।

উপরন্তু, এটাও প্রতিষ্ঠিত বাস্তবতা যে, সামান্যতম পরিবর্তন ও একটি অক্ষরের হেরফের ছাড়াই ভাষা ও সাহিত্যের এই বিস্ময় আমাদের নিকট একেবারে আক্ষরিকভাবে স্থানান্তরিত হয়েছে। ফলশ্রুতিতে, এই বাস্তবতা সর্বজনবিদিত যে, আল্লাহর জমিনে কুরআনই কেবল দ্বীনের চূড়ান্ত প্রমাণ নয়, বরং স্বীয় যুগের ভাষার ক্ষেত্রেও কুরআনের ফয়সালাই শেষ কথা এবং এটাই চূড়ান্ত দলীল।

কুরআন মাজিদের পর নবীর হাদিস ও সাহাবিদের আসারের ভাণ্ডারে এই ভাষা পাওয়া যায়। এতে সন্দেহ নেই যে, [হাদিস ও আসারের বৃহৎ অংশ] রেওয়ায়েত বিল মা’না হওয়ায় এই ভাণ্ডারের সামান্য অংশ ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণায় নমুনা ও প্রমাণক হিসেবে উপস্থাপনযোগ্য। তা সত্ত্বেও যতটুকু বাকি আছে, তা সাহিত্যিক রুচিবোধ সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য মূল্যবান রত্ন।

এ ভাষা আরব ও অনারবের মাঝে সবচেয়ে স্পষ্টভাষী নবী মুহাম্মদ ও সাহাবিগণের প্রাঞ্জল বাকরীতি; এবং শব্দ-বান্ধারা ও ভাষারীতি বর্ণনার দিক দিয়ে এটা ঐ ভাষার সর্বোৎকৃষ্ট নমুনা, যাতে কুরআন নাযিল হয়েছিল। নবী (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ)-এর দুআ, উপমা ও সাহাবিগণের সাথে তার কথোপকথন সাধারণভাবে রেওয়ায়েত বিল লাফয তথা বর্ণনাকারী দ্বারা হুবহু শাব্দিকভাবে বর্ণিত হয়েছে, আর এ কারণে কুরআনীয় ভাষার অধিক নমুনা এসব রেওয়ায়েতে পাওয়া যায়। ফলশ্রুতিতে, কুরআনের ভাষার শিক্ষার্থী যদি এই ভরা সমুদ্রজলে ডুব দেয়, তবে সে বহু মণি-মুক্তা সংগ্রহ করতে সমর্থ হবে; এবং কুরআনের শব্দ ও অর্থের নানা জটিলতা নিরসনে এ ভাণ্ডার থেকে বিপুল সহায়তা লাভে সক্ষম হবে।

এরপর এ ভাষার সবচেয়ে বড় উৎস আরবি সাহিত্য। এটা ইমরুল কায়েস, যুহায়ের, আমর ইবনে কুলছুম, লাবিদ, নাবিগা, তারাফা, আনতারা, আ'শা ও হারিছ ইবনে হালিযার ন্যায় কবি এবং কুস ইবনে সায়িদার ন্যায় বক্তার ভাষা। বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ জানে যে, এ সাহিত্যের বড় অংশ কবিদের দিওয়ান তথা কাব্য সংকলনে এবং "আসমায়িয়াত", "মুফাদ্দিলিয়াত", "হামাসা", "সাবআ' মুয়াল্লাকাত" এবং জাহিয ও মুবাররাদ-এর মতো অন্যান্য সাহিত্যিকের লিখিত গ্রন্থে সংরক্ষিত আছে। বর্তমান সময়ে জাহেলী কবিদের বহু দিওয়ান প্রকাশিত হয়েছে, যা পূর্বে প্রকাশ পায়নি। এতে সন্দেহ নেই যে, আরবি ভাষার অধিকাংশ শব্দ ভাণ্ডার ঐ ভাষাভাষীদের ইজমা ও তাওয়াতুরের মাধ্যমে [আমাদের পর্যন্ত] পৌঁছেছে এবং এ শব্দ ভাণ্ডারের প্রধান উৎস: "তাহযীব", "আল-মুহকাম", "আস-সিবাহ", "আল-জামহুরা" ও "আন-নিহায়া"-সহ অন্যান্য গ্রন্থে সংরক্ষিত রয়েছে। তথাপি এর সাথে এটাও বাস্তবতা যে, আরবি শব্দ ভাণ্ডারের যে অংশ এমন মুতাওয়াতির নয়, সে অংশের পর্যালোচনার ক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রমাণিক দলীলও আরবি সাহিত্য। এর মাঝে যদি কোনো জিনিসের সংযোজনও ঘটে, তবে ঠিক যেভাবে হাদিসের সমালোচক পণ্ডিতগণ বিশুদ্ধ ও দুর্বল বর্ণনার মাঝে পার্থক্য করতে পারেন, সেভাবে বর্ণনাসূত্র ও মূলপাঠের সুস্পষ্ট মানদণ্ডের আলোকে ভাষা সমালোচকগণ শুদ্ধ ও অশুদ্ধ জিনিস একে অপর থেকে আলাদা করতে সক্ষম। ফলশ্রুতিতে, শব্দ ও সাহিত্যের বিদগ্ধ পণ্ডিতগণ সর্বদা এ ব্যাপারে একমত যে, কুরআনের পর এই সাহিত্যের উপর নির্ভর করা যায়; এবং বর্ণনা পরম্পরার শুদ্ধতা ও রেওয়ায়েত বিল লাফয দ্বারা বর্ণিত হওয়ায় ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণায় এ সাহিত্য নমুনা ও প্রমাণকের মর্যাদা রাখে।

[চলবে]

ইসলামি রাজনীতি ও কুরআনের আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা

জাভেদ আহমেদ গামিদি

কুরআনের দুটি আয়াত দ্বারা কিছু ইসলামি আলেম ‘দ্বীন প্রতিষ্ঠা’ করাকে ফরজ বলে দলিল পেশ করেন। এই দুটি আয়াতের মাধ্যমে তারা ইসলামি বিধানের মধ্যে “ইকামতে দ্বীন” নামে আলাদা একটি ফরজ বিধানের বৃদ্ধি ঘটিয়েছেন।কুরআনের উক্ত আয়াত দুটি সম্পর্কে তাদের এমন ব্যাখ্যা আমার মতে আরবি ভাষার ব্যবহারবিধি এবং পবিত্র কুরআনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।অতএব এই আয়াত দুটি সম্পর্কে আমি আমার গবেষণা, যুক্তি ও দলিলসহ এখানে পেশ করছি।

প্রথম আয়াত:

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ
لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

“তিনিই সে সত্তা, যিনি তাঁর রাসুলকে হেদায়েত ও সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন সকল দ্বীনের উপর এই দ্বীনকে বিজয়ী করতে, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।” (সুরা সফ, ৯)

এই আয়াত সম্পর্কে চিন্তা করুন। এই আয়াতে নবী (সা.) সম্পর্কে আল্লাহতায়ালা তাঁর ঐ সুন্নাতের কথা বর্ণনা করেছেন, যা পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে রাসুলদের আলোচনা প্রসঙ্গে স্পষ্ট বিধান হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। সে সুন্নাতটি হচ্ছে: রাসুলের মাধ্যমে আল্লাহতায়ালার হুজ্জাত (সত্যের চূড়ান্ত প্রমাণ) যখন কোনো জাতির সামনে স্পষ্ট হয়, তখন আল্লাহ তাঁর রাসুলকে উক্ত জাতির উপর বিজয় দান করেন।

একজন নবী তার জাতির মোকাবেলায় ব্যর্থ হতে পারেন। তবে রাসুল সর্বাবস্থায় তার জাতির উপর বিজয়ী হবেন। এই বিজয় রাসুলের জীবদ্দশাতে অথবা তার মৃত্যুর পরে তার সঙ্গী-সাথি ও সাহায্যকারীদের মাধ্যমে অর্জিত হয়। সুরা মুজাদালাতে বর্ণিত হয়েছে:

إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ ﴿٢٠﴾
كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢١﴾

“নিশ্চয় যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা হবে চরম লাঞ্ছিতদের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ লিখে রেখেছেন, ‘আমি অবশ্যই বিজয়ী হব এবং আমার রাসুলগণও। নিশ্চয় আল্লাহ মহাশক্তিমান মহাপরাক্রমশালী। (সুরা মুজাদালাহ: ২০-২১)

নবী (সা.)-ও আল্লাহতায়ালার রাসুল ছিলেন। তাই রাসুলদের এই সুন্নাত পবিত্র কুরআনে নবী (সা.)-এর বিষয়েও বর্ণিত হয়েছে। পবিত্র কুরআনে সাহাবিদের স্পষ্টভাবে বলে দেওয়া হয়েছে যে, তিনি রাসুল (সা.) অবশ্যই তার জাতি অর্থাৎ আরব মুশরিকদের উপর বিজয় অর্জন করবেন। সুরা ফাতহে বর্ণিত হয়েছে:

وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿٢٢﴾
سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿٢٣﴾

“(আর যারা কুফরী করেছে) তারা যদি তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে তবে তারা অবশ্যই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে, তারপর তারা কোনো অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না। এটাই আল্লাহর বিধান – পূর্ব থেকেই যা চলে আসছে, আপনি আল্লাহর বিধানে কোনো পরিবর্তন পাবেন না।” (সুরা ফাতহ, ২২-২৩)

এখন প্রশ্ন হলো, আল্লাহতায়ালার এই সুন্নাত কীভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে? পবিত্র কুরআন থেকে স্পষ্ট যে, সাহাবিদের হুকুম দেওয়া হয়েছিল, তারা যেন আরব মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করে। যুদ্ধের লক্ষ্য স্থির করা হয় এভাবে যে, আরব মুশরিকরা হয় ইসলাম কবুল করবে, না হলে তাদেরকে জমিন থেকে চিরতরে মুছে ফেলা হবে। সুরা ফাতহে বর্ণিত হয়েছে:

تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ

"তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে অথবা তারা ইসলাম কবুল করে নিক।" (সুরা ফাতহ: ১৬)

সাহাবিদের বলা হয়েছিল তারা যেন মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করে, যতক্ষণ না আরব ভূখণ্ডে সত্য দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়। আরব মুশরিকদের বলে দেওয়া হয়েছিল যে, তারা যদি তাদের অবস্থান থেকে ফিরে না আসে, তাহলে তাদের পরিণতি ঐ সকল জাতির মতই হবে, যাদের নিকট রাসুল প্রেরণ করার পরে তারা অস্বীকার করেছিল। সুরা আনফালে বর্ণিত হয়েছে:

قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ إِن يَنتَهُوا۟ يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا۟ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿﴾ وَقَٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُۥ لِلَّهِ فَإِنِ ٱنتَهَوْا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿﴾

"যারা কুফরী করে তাদেরকে বলুন, যদি তারা বিরত হয়, তবে যা আগে হয়েছে আল্লাহ তা ক্ষমা করবেন। কিন্তু তারা যদি অন্যায়ের পুনরাবৃত্তি করে, তাহলে পূর্ববর্তীদের (সাথে আমার আচরিত) রীতি তো রয়েছেই। তোমরা তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে থাক; যতক্ষণ না ফিতনা দূর হয় এবং আল্লাহর ধর্ম সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। অতঃপর তারা যদি বিরত হয়, তাহলে নিশ্চয় আল্লাহ তাদের কার্যাবলীর সম্যক দ্রষ্টা।" (সুরা আনফাল, ৩৮-৩৯)

সাহাবিদের সাথে আল্লাহতায়ালা ওয়াদা করেছিলেন যে, তারা এই যুদ্ধে অবশ্যই বিজয় অর্জন করবে এবং আরব ভূখণ্ডে তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। সুরা নুরে বর্ণিত হয়েছে:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে জমিনে রাষ্ট্র ক্ষমতা দান করবেন, যেমন তিনি রাষ্ট্র ক্ষমতা দান করেছেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত করবেন তাদের দ্বীনকে, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন।" (সুরা নুর, ৫৫)

ইতিহাস সাক্ষী যে, এই ওয়াদা আল্লাহতায়ালা নবী (সা.)-এর জীবদ্দশাতেই পূরণ করেছিলেন এবং দ্বীন-ইসলামকে আরব ভূখণ্ডের সমস্ত ধর্মের উপরে বিজয় দান করেছিলেন। রাসুল (সা.) ঘোষণা করেছিলেন: "আরব ভূখণ্ডে সত্য দ্বীনের সাথে অন্য কোনো ধর্ম উপস্থিত থাকতে পারে না।" প্রকৃতপক্ষে রাসুলদের প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এই সুন্নাত নবী (সা.)-এর বেলায় পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয় এবং কুরআনে বর্ণিত আল্লাহর এই বিধান সর্বাবস্থায় অটল ছিল।

উপরে উল্লিখিত সুরা সফের আয়াতে মূলত আল্লাহতায়ালার এই সুন্নাতের বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে। আমরা যদি আয়াতটি ভালোভাবে বিশ্লেষণ করে দেখি তাহলে স্পষ্ট হবে যে, ليظهره ক্রিয়ার কর্তৃকারক হিসেবে যে সর্বনামটি এসেছে, তা আরবি ভাষার নিয়ম অনুযায়ী 'আল্লাহ'-এর স্থলবর্তী এবং কর্মকারক হিসেবে যে সর্বনামটি এসেছে সেটা ইশারা হচ্ছে الهدى অর্থাৎ দ্বীনে হক। কেননা الدين শব্দের পরে এখানে وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ কথাটি যুক্ত হয়েছে। আমরা এটা জানি যে, المشركونশব্দটি পবিত্র কুরআনে কেবলমাত্র আরব ভূখণ্ডের তৎকালীন মুশরিকদের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়েছে। এজন্য الدين শব্দটির 'আলিফ লাম' তথা আর্টিকেল স্পষ্টত নির্দিষ্টকরণের জন্য এসেছে। সুতরাং এখানে সকল ধর্মের উপর বিজয় অর্জন বলতে শুধুমাত্র আরব ভূখণ্ডের সকল ধর্মকে বোঝানো হয়েছে, পৃথিবীর সকল ধর্ম নয়। অতএব বিশ্লেষণ অনুযায়ী আয়াতের সঠিক অনুবাদ আমরা এভাবে করতে পারি: "তিনিই তাঁর রাসুলকে হেদায়েত অর্থাৎ সত্য ধর্মসহ প্রেরণ করেছেন, যেন তিনি এই দ্বীনকে (আরব ভূখণ্ডের) সমস্ত ধর্মের উপর বিজয়ী করতে পারেন, যদিও এটা মুশরিকরা অপছন্দ করে।" (সুরা সফ, ৯)

আরবি ভাষার ব্যবহার বিধি এবং পবিত্র কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে সুরা সফের উক্ত আয়াতের সঠিক অনুবাদ মূলত এটাই হবে।আয়াতের এই অনুবাদের মাধ্যমে এটা স্পষ্ট হয় যে, দ্বীন প্রতিষ্ঠা ও বিজয়ের জন্য কোনো ব্যক্তির চেষ্টা ও সংগ্রামের সাথে এই আয়াতের সম্পর্ক নেই। সুরা সফের উক্ত আয়াতে রাসুল (সা.)-এর সাহাবিদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে এবং এর উদ্দেশ্য হল রাসুল (সা.)-এর সমর্থনে জিহাদের অনুপ্রেরণা।

রাসুল (সা.)-এর “نصرت” বা সমর্থন করা কুরআনের আলোকে তার অনুসারীদের অর্থাৎ সাহাবিদের বিশেষ দায়িত্ব।সুরা সফে আলোচনা প্রসঙ্গে দুজন সম্মানিত রাসুলের উদ্ধৃতি পেশ করে নবী (সা.)-এর অনুসারীদের সতর্ক করা হয়েছিল যে, তারা যেন ঐ রাসুলদের জাতি অর্থাৎ বনি ইসরাইলের মত রাসুল (সা.)-এর “نصرت” বা সমর্থনের দায়িত্ব আদায়ে গাফিলতি বা অলসতা না করে।এরপরে তাদেরকে সুসংবাদ দেওয়া হয় যে, আল্লাহ তার রাসুলকে অবশ্যই বিজয় দান করবেন। পরবর্তীতে এই উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য সাহাবিদের জিহাদ করার হুকুম দেওয়া হয় এবং তাদেরকে বলা হয় যে, তারা যেন রাসুলের সাহায্য-সমর্থনেরএই দায়িত্ব পুরোপুরিভাবে পালন করে। সুরা সফের সমাপ্তি আলোচনা প্রসঙ্গে বনি ইসরাইলের সর্বশেষ রাসুল হযরত ঈসা (আ.)-এর হাওয়ারি (ঈসা (আ.)-এর সাহাবি)-দের উদাহরণ পেশ করে বলা হয়, যখন তাদের রাসুল তাদেরকে সাহায্যের এই দায়িত্ব আদায়ের জন্য বলে, তখন তারা সমস্ত বাধা-বিপত্তি পেছনে ফেলে এই দায়িত্ব পালনের জন্য সামনে অগ্রসর হয় এবং আল্লাহ হযরত ঈসা (আ.)-কে তার শত্রুদের উপর বিজয়ী করেছিলেন।

পবিত্র কুরআনের অন্যত্র বর্ণিত এমন ঘটনাগুলো বস্তুত একই আলোচনা প্রসঙ্গে এসেছে। এই হুকুম নবী (সা.)-এর সাহাবিদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। নবী (সা.) ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তির সাথে কিয়ামত পর্যন্ত এই আয়াতের হুকুম সম্পৃক্ত নয় যে, তিনি বা তারা দ্বীন-ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য নিজের চেষ্টা ও সংগ্রামকে সুরা সফের উক্ত আয়াতের সাথে সম্পৃক্ত করবেন।

অন্যদিকে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছিলেন একজন উদারমনা ব্যক্তি, যিনি সারাজীবন ধর্মের শিক্ষা দিয়েছিলেন স্নিগ্ধতা, ভদ্রতা ও যুক্তি সহকারে। এমন একজন মানুষ কীভাবে হঠাৎ এই দিকনির্দেশনা দিতে পারেন, যার ফলস্বরূপ পিটাপিটি, মানসিক চাপ দিয়ে নামাজের মতো একটি পবিত্র কাজকে শারিরীকভাবে জোর করে করানোর পর্যায়ে নামিয়ে আনা হবে?

দ্বিতীয় আয়াত:

شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ
إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ

"তিনি তোমাদের জন্য নির্ধারিত করেছেন ধর্ম, যার নির্দেশ দিয়েছিলেন নুহকে এবং যা আমি প্রত্যাদেশ করেছি তোমাকে এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইব্রাহিম, মুসা ও ঈসাকে এই বলে যে, তোমরা ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং এতে মতভেদ করো না।" (সুরা শুরা, ১৩)

এই আয়াতে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, মোহাম্মদ (সা.) কোনো নতুন দ্বীন নিয়ে আগমন করেননি। না তার পূর্বে আগত নবীদের আলাদা কোনো ধর্ম ছিল। বরং একই দ্বীন-ইসলাম, যা সমস্ত নবীদের দেওয়া হয়েছিল এবং হযরত নুহ ও ইব্রাহিম, মুসা ও ঈসা (আ.) এই একই দ্বীন-ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলেন এবং মুহাম্মদ (সা.)-ও এই দ্বীন-ইসলামের মিশন নিয়ে আগমন করেছিলেন।এরপরে বলা হয়েছে, এই দ্বীন সমস্ত নবী ও তার উম্মতদেরকে এই নির্দেশনার সাথে দেওয়া হয়েছে যে, " اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَ لَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ"।

এ নির্দেশনার অর্থ কী? এর অর্থ বুঝতে হলে আয়াতের শব্দের দিকে লক্ষ্য করুন। আয়াতের শব্দগুলোর মধ্যে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ শব্দ হচ্ছে: আকিমু।এই আকিমু শব্দটি বাবে-ইফাল থেকে ফেলে-আমর অর্থাৎ আদেশসূচক ক্রিয়া হয়েছে।আরবি ভাষায় যদি এই আকিমু শব্দটি সরাসরি মাফুল বা কর্মকারকের সাথে যুক্ত হয়, তাহলে তা নিম্নেবর্ণিত দুটি অবস্থায় ব্যবহৃত হয়:

- প্রথম অবস্থা: বস্তুগত জিনিসের ক্ষেত্রে আকিমু শব্দটি আক্ষরিক অথবা রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়।
- দ্বিতীয় অবস্থা: আকিমু শব্দটি বিমুর্ত বা তাত্ত্বিক বিষয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

প্রথম অবস্থায় বস্তুগত জিনিসের ক্ষেত্রে আকিমু শব্দটির যে সকল অর্থে পবিত্র কুরআন ও আরবি সাহিত্যের ব্যবহারবিধি অনুসন্ধান দ্বারা জানা যায়, তা হচ্ছে:

১- সোজা করা বা সোজা রাখা। যেমন, اقام الدرء অর্থাৎ সে বর্শার বক্রতা দূর করেছে। اقام الصف অর্থাৎ সে কাতার সোজা করেছে।আরবি সাহিত্যে শব্দটির কিছু ব্যবহার নিচে দেখানো হলো:

সাআলবা বিন আমর বলেন: اكب عليها كاتب بدواته يقيم يديه تارة ويخالف "কোনো একজন লেখক সেগুলোর ওপর তার দোয়াতের সাহায্যে নকশা এঁকে দিচ্ছিল, কখনো হাত সোজা করে আবার কখনো এর বিপরীতভাবে।"

রূপক অর্থেও এই শব্দটি আসতে পারে, যেমন: তোমার অন্তরের বক্রতা দূর কর।

ইয়াজিদ বিন খাদাক বলেন: اقيموا بنى النعمان عنا صدوركم والا تقيموا كارهين الرؤسا "ওহে নোমানের ছেলেরা! আমাদের প্রতি তোমাদের হৃদয়ের বক্রতা দূর কর। নচেৎ স্মরণ রাখ যে, তোমরা তোমাদের মাথা সোজা করতে বাধ্য হবে।"

সুরা রহমানে বলা হয়েছে: وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ (আর দাঁড়ি-পাল্লায় সোজা ওজন করো ন্যায়ের সাথে) [সুরা রহমান, ৯]

আল্লাহ আরও বলেন : وَ اَقِيۡمُوۡا وُجُوۡهَكُمۡ عِنۡدَ كُلِّ مَسۡجِدٍ (প্রত্যেক নামাজের সময় নিজের মুখ আল্লাহতায়ালার দিকে সোজা রাখুন) [সুরা আরাফ, ২৯]

সুরা রুমে উল্লেখ রয়েছে: فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ الْقَيِّمِ (সুতরাং আপনার মুখ সোজা পথে সোজা করে রাখুন) [সুরা রুম, ৪৩]

২. কোন চলন্ত বস্তুকে থামানোর ক্ষেত্রে এই শব্দের ব্যবহার আরবি সাহিত্যে দেখা যায়। যেমন, বিশামা বিন গাদির নিজের উটের প্রশংসা করে বলেছেন: فاقام هوذلة الرشاء، وان تخطى يداه يمد بالضبع (সে কুপের নড়তে থাকা রশি স্থির করেছে, আর তার হাত ব্যর্থ হয়ে গেলে সে তার বাহু প্রসারিত করে দেয়)।

৩. কোনো বসে থাকা বস্তু বা ব্যক্তিকে ওঠানো ক্ষেত্রেও এই শব্দটি ব্যবহার হয়।যেমন, اقام الرجل (তিনি লোকটিকে উঠিয়েছেন), اقام الجِدار (তিনি প্রাচীর দাঁড় করিয়েছেন)।সুরা কাহাফে উল্লেখ রয়েছে: فَوَجَدَا فِيۡهَا جِدَارًا يُّرِيۡدُ اَنۡ يَّنۡقَضَّ فَاَقَامَهٗ (অতঃপর সেখানে তারা এক প্রাচীর দেখতে পেল, যা পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল, তখন সে সেটাকে দাঁড় করে দিল) [সুরা কাহাফ, ৭৭]

এখান থেকে রূপক ব্যবহার হচ্ছে: أقام السوق (তিনি বাজার বসিয়েছেন বা বাজার গরম করেছেন)।

ইবনে খুযিইমের কবিতার পংক্তি: اقا مت غزالة سوق الضراب لاهل العراقين حولاً قميطا (গাজালা সারা বছর বসরা এবং কুফাবাসীদের জন্য যুদ্ধের বাজার গরম করে রেখেছিল)। সুরা নিসায় উল্লেখ হয়েছে: وَاِذَا كُنۡتَ فِيۡهِمۡ فَاَقَمۡتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ (এবং যখন আপনি তাদের মধ্যে অবস্থান করবেন, তখন তাদের জন্য নামাজ দাঁড় করান... [সুরা নিসা, ১০২]।সুরা কাহফে এসেছে: فَلَا نُقِيۡمُ لَهُمۡ يَوۡمَ الۡقِيٰمَةِ وَزۡنًا (কিয়ামতের দিন তাদের জন্য আমি কোন প্রকার দাঁড়িপাল্লা দাঁড় করাবো না) [সুরা কাহফ, ১০৫]।

এগুলো শব্দটির ব্যবহারের প্রথম অবস্থা অর্থাৎ বস্তুগত জিনিসের ক্ষেত্রে এটার ব্যবহার। দ্বিতীয় অবস্থায় অর্থাৎ বিমূর্ত বা তাত্ত্বিক বিষয়েরে সাথে যখন এই তিনটি অর্থ সম্পৃক্ত হয়, তখন তা থেকে নিম্নোক্ত অর্থ সৃষ্টি হয়:

১. বসে থাকা বস্তু বা ব্যক্তিকে ওঠানোর অর্থ থেকে তাত্ত্বিক বিষয়ের ক্ষেত্রে অর্থ হবে: প্রকাশ করা, প্রচলন ঘটানো বা প্রয়োগ করা। যেমন, 'اقم الحق' (সত্য প্রকাশ করো), ' اقم الحد عليه' (তার ওপর শাস্তি প্রয়োগ করো)।

২. সোজা করা বা সোজা রাখার অর্থ থেকে তাত্ত্বিক বিষয়ের ক্ষেত্রে শব্দটির অর্থ দাঁড়াবে: ঠিকঠাক করা বা ঠিকঠাক রাখা। যেমন, সুরা তালাকে এসেছে: وَاَقِيْمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ (আর {সাক্ষীদাতাগণ} তোমাদের সাক্ষ্যকে আল্লাহর জন্য একদম ঠিক রাখো) [সুরা তালাক, ২]

৩. কোনো বস্তুকে থামানোর অর্থ থেকে তাত্ত্বিক বিষয়ের ক্ষেত্রে শব্দটির অর্থ দাঁড়াবে: একটি বিষয়কে সুস্থির, অনড়, সংরক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও বহাল করা।সুরা বাকারায় উল্লেখ রয়েছে: فَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ(তারপর যদি তোমরা আশংকা করো যে, তারা আল্লাহর সীমারেখা রক্ষা করে চলতে পারবে না) [সুরা বাকারা, ২২৯] সুরা মায়িদায় উল্লেখ রয়েছে: قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لَسْتُمْ عَلٰى شَىْءٍ حَتّٰى تُقِيْمُوا التَّوْرٰةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ (বলুন, হে কিতাবীরা! তাওরাত, ইনজিল ও যা তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে তোমাদের প্রতি নাযিল হয়েছে, তা {তোমাদের জীবনে} প্রতিষ্ঠিত ও বহাল না করা পর্যন্ত তোমরা কোন ভিত্তির উপর নও) [সুরা মায়েদা, ৬৮]।

এটাই শেষ অর্থ যেটাকে কুরআনের অধিকাংশ অনুবাদকগণ প্রতিষ্ঠিত বা কায়েম করা অথবা প্রতিষ্ঠিত বা কায়েম রাখা হিসেবে ব্যক্ত করেছেন।অর্থাৎ কোনো বিষয়কে নিজের জীবনে স্থায়ী, অনড়, সংরক্ষিত ও বহাল রাখা। আরও সহজ করে বললে, নিজের জীবনবিধান বানিয়ে ফেলা। সে হিসেবে সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদি (রহ.) তার তাফসির তাফহিমুল কুরআনে সুরা মায়েদার ৬৮-নং আয়াতে উল্লিখিত حَتّٰى تُقِيْمُوا التَّوْرٰةَ وَالْاِنْجِيْلَ-এর অনুবাদ করেছেন:

جب تک تم تورات اور انجیل اور اُن دوسری کتابوں کو قائم نہ کرو
(যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তাওরাত এবং ইনজিল ও অন্যান্য কিতাবগুলিকে কায়েম না করো)।

এরপরে তিনি এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন:
تورات اور انجیل کو قائم کرنے سے مراد راست بازی کے ساتھ اُن کی پیروی کرنا اور اُنھیں اپنا دستورِ زندگی بنانا ہے
(তাওরাত ও ইঞ্জিল কায়েম করার অর্থ হল: ন্যায়পরায়ণতার সাথে এই গ্রন্থগুলির অনুসরণ করা এবং এগুলিকে নিজের জীবনবিধান বানানো)।

এখন আমরা একটু ভালোভাবে লক্ষ্য করি, আয়াতে উল্লিখিত اقيموا ক্রিয়ার কর্মকারক الدين (ধর্ম) যেহেতু একটি বিমূর্ত বিষয়, তাই প্রথম অবস্থায় বস্তুগত জিনিসের ক্ষেত্রে আকিমু শব্দটির যেসব অর্থ হয়, সেগুলো এখানে কোনোভাবেই হবে না।এটা স্পষ্ট যে, শুধু দ্বিতীয় অবস্থার অর্থগুলো হতে পারে।সে অর্গগুলোর মধ্যে প্রথম অর্থ হচ্ছে: প্রকাশ করা বা প্রয়োগ করা।প্রয়োগ করার অর্থটি এখানে অবশ্যই হতে পারতো, কিন্তু দুটি বিষয় এক্ষেত্রে বাধা হয়ে আছে:

প্রথম বিষয়: যদি প্রয়োগ করার অর্থ নেওয়া হয়, তাহলে আরবি ভাষার ব্যবহারবিধি অনুযায়ী উদাহরণস্বরূপ এখানে علٰى فلان (অমুকের ওপর)-এর উল্লেখ কিংবা ঊহ্য রাখা জরুরি।যেমন, اقيموا الحدود على الناس এই বাক্যে على الناس উল্লেখ রয়েছে।কিন্তু এই আয়াতে এ ধরনের কোন শব্দের না উল্লেখ রয়েছে, আর না ঊহ্য আছে বলে কোনো আলামত পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় বিষয়: প্রয়োগ করার অর্থ নিলে اقيموا الدين বাক্যটির মধ্যে এবং তার সাথে সম্বন্ধযুক্ত বাক্য لا تتفرقوا فيه-এর মধ্যে ঐ মিলটি পাওয়া যায় না, যা একটি বাক্য ও তার সাথে সম্বন্ধযুক্ত বাক্যের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য উচ্চতর সাহিত্যে বিদ্যমান থাকা জরুরি।একই সমস্যা দাঁড়াবে যদি এর অনুবাদ ‘প্রকাশ করা’ নেওয়া হয়। لا تتفرقوا فيه-এর সাথে ‘প্রকাশ করা’ অর্থটির কোনো মিল দেখানো কোনোভাবেই সম্ভব নয়, এটা একদম পরিষ্কার।এসব কারণে এই আয়াতে আকিমু শব্দের এই অর্থ কোনোভাবেই হতে পারে না।এরপর আরও দুটি অর্থ রয়ে যায়।সেগুলো হচ্ছে: দ্বীনকে পুরোপুরি ঠিকঠাক রাখা এবং নিজের জীবনে একদম স্থির, অনঢ়, সংরক্ষিত ও বহাল রাখা। এর সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ পবিত্র কুরআনে সালাত কায়েম করার আদেশ। কুরআনের অনেক জায়গায় আল্লাহতায়ালা এই হুকুমটি এই ‘আকামা’ ক্রিয়ার মাধ্যমে দিয়েছেন।আর এরপর আল্লাহতায়ালা সুরা মাআরিজে নিজেই এর অর্থ এভাবে পরিষ্কার করেছেন:

ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآئِمُونَ

“যারা নিজের নামাজের ধারাবাহিকতা বজায় রাখে।” (সুরা মাআরিজ, ২৩)

পুনরায় বলা হয়েছে:

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ

"আর যারা তাদের সালাতের যত্ন নেয়।" (সুরা মাআরিজ, ৩৪)

অর্থাৎ যারা নিজেদের সালাতের উপর স্থির থাকে এবং নামাজকে একদম ঠিকঠাক, অনঢ় ও বহাল রাখে। সুতরাং উক্ত আয়াতে উল্লিখিত اقيموا ক্রিয়াটি নিঃসেন্দহে এই অর্থে ব্যবহৃতহয়েছে। আল্লাহতায়ালা এই আয়াতে আমাদেরকে যখন জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি গোটা মানবজাতিকে একই দ্বীন দিয়েছেন, তখন কথার প্রসঙ্গের দাবি এটাই যে, এই দ্বীনের ব্যাপারে যে দায়িত্ব মানুষের ওপর আসে, তা এক কথায় জানিয়ে দেবেন। সে হিসেবেই আল্লাহতায়ালা বলেন: اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ (এই দ্বীনকে সঠিক ও পরিপূর্ণভাবে নিজের জীবনে রক্ষণাবেক্ষণ করো এবং এর মধ্যে বিচ্ছিন্নতা তৈরি করো না। বিচ্ছিন্নতা বা تَتَفَرَّقُ তৈরি করার অর্থ হচ্ছে: মানুষ এই ইসলামের ওপর নিজের জীবনকে পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত করার পরিবর্তে কিছু অংশ পালন করে ও কিছু অংশ ছেড়ে দেয় এবং এর মধ্যে নানা রকম বিদআত প্রবেশ করায়। এই কাজ স্পষ্টতই اَقِيْمُوا الدِّيْنَ (দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত রাখো) হুকুমটির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। সুতরাং আয়াতের এই অর্থ নেওয়ার দ্বারা দুটি সম্বন্ধযুক্ত বাক্যের মধ্যে পুরোপুরি সম্পর্ক স্থাপিত হয়। আর ঠিক এ ধরনের হুকুম কুরআনের অন্য জায়গায়ও দেওয়া হয়েছে। যেমন, আল্লাহ বলেন: وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا৫ (সবাই মিলে আল্লাহতায়ালার রশি মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরো এবং বিচ্ছিন্ন হয়ো না)। এই দিকনির্দেশনার সারমর্ম হচ্ছে: এই দ্বীন গ্রহণ করে আবার পুনরায় ছেড়ে দেওয়ার জন্য আল্লাহতায়ালা আমাদেরকে দেননি। বরং সকল নবী এবং তাদের উম্মতদেরকে এই দ্বীন এই নির্দেশনার সাথে দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেন সততার সাথে এই দ্বীনকে মেনে চলে এবং সঠিকভাবে ও সুচারুরূপে তা পালন করে, বিদআত সৃষ্টি করে এই দ্বীনের রূপ যেন তারা পরিবর্তন না করে।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে আরাবি (রহ.) লিখেন: ای اجعلوه قائمًا، يريد دائمًا مستمرًا محفوظًا مستقرًا من غير خلاف فيه ولا اضطراب عليه (এটাকে সুসংহত ও স্থির রাখো। অর্থাৎ নিরবিচ্ছিন্ন, সংরক্ষিত ও সুদৃঢ় রাখো, এটার ব্যাপারে কোনো ধরনের বিবাদ-বিসংবাদ না করে এবং এটিতে চিড় না ধরিয়ে। [আহকামুল কুরআন]।

আরবি ভাষার বিশিষ্ট পণ্ডিত ইমাম যামাখশারির মতও তাই। তিনি তার কাশশাফ গ্রন্থে লিখেছেন: والمراد اقامة دين الاسلام الذى هوتوحيد اللّٰه وطاعته والايمان برسله وكتبه وبيوم الجزاء وسائر ما يكون الرجل باقامته مسلمًا (এবং এর মানে হলো: দ্বীন-ইসলাম নিজের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করা, যা আল্লাহতায়ালার তাওহিদ ও তাঁর অনুগত্য, তাঁর রাসুল, আসমানি গ্রন্থ এবং কিয়ামত দিবসের উপর ঈমান আনা। সেই সাথে ঐ সকল বিষয়কেও গ্রহণ করা, যা গ্রহণ করার মাধ্যমেই মূলত একজন মানুষ মুসলিম হতে পারে)।

আলুসি (রহ.) লিখেছেন: والمراد باقامته تعديل اركانه وحفظه من ان يقع فيه زيغ والمواظبة عليه (কায়েম শব্দের মাধ্যমে বোঝানো হচ্ছে: ইসলামের বিধি-বিধানের উপর সঠিকভাবে আমল করা, সমস্ত প্রকার খারাপ বস্তু থেকে ইসলামকে হেফাজত করা এবং ইসলামের উপর নিজের আমলকে ধারাবাহিকভাবে বজায় রাখা) [রুহুল মাআনি]।

উস্তাদ ইমাম আমিন আহসান ইসলাহি (রহ.) লিখেছেন: ‘‘কায়েম করার অর্থ: ইসলামের যে বিষয়টি বিশ্বাস করতে হবে, তা স্বচ্ছতার সাথে পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করা এবং যা পালন করতে হবে, তা সততা ও ন্যায়পরায়ণতার সাথে পালন করা। নিজের পরিবার ও আত্মীয় স্বজনের দিকে এই দৃষ্টি রাখা যে, তারা যেন ইসলাম থেকে গাফিল না হয়। সেই সাথে এই ব্যবস্থাও করতে হবে যে, বিদআতি লোকজন ইসলামের মধ্যে যেন কোন প্রকার বিদআত প্রবেশ করাতে না পারে।’’ (তাদাব্বুরে কুরআন)।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্টভাবে প্রমাণ হয়েছে যে, ইকামতে দ্বীন বা দ্বীন প্রতিষ্ঠা করার কোন হুকুম উক্ত আয়াতে দেওয়া হয়নি। আর না এটা ইসলামের ফরজ বিধানের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। বরং আল্লাহতায়ালা ঐ আয়াতের মধ্যে গোটা দ্বীন-ইসলামের সাথে সম্পর্কযুক্ত একটি মৌলিক নীতিগত দিকনির্দেশনা আমাদের দিয়েছেন।

কুরআন ও সুন্নাতের মাধ্যমে যে ইসলাম আমাদের নিকট পৌঁছেছে, তা পরিপূর্ণভাবে নিজের জীবনে ধারণ করার হুকুম আল্লাহতায়ালা উক্ত আয়াতের মধ্যে আমাদের দিয়েছেন। আর এই হেদায়েতের দাবি অনুযায়ী আমাদের বিশ্বাস ও নীতি-নৈতিকতা, আমাদের ইবাদত ‘নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত’, আমাদের দাওয়াত ও তাবলীগের নিয়ম পদ্ধতি, আমাদের রাষ্ট্র, সমাজ এবং যুদ্ধনীতি ইত্যাদি সমস্ত বিধি-বিধানের মধ্যে যা বিশ্বাস করার, সেগুলোর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং যা পালন করার বিষয়, তা পরিপূর্ণভাবে পালন করতে হবে। তবে তা এজন্য নয় যে, এই বিধানগুলো বা এগুলোর মধ্য থেকে কোনো একটি বিধান اقيموا শব্দের অর্থের মধ্যে রয়েছে। বরং এজন্য যে, এই বিধানগুলো কুরআন মাজিদ এবং নবী (সা.)-এর সুন্নাতের আলোকে الدِّيْنَ-এর অন্তর্ভুক্ত, আর উক্ত আয়াতে আমাদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে যে, দ্বীন ইসলামকে যেন আমরা আমাদের নিজের জীবনে পরিপূর্ণভাবে ধারণ করি। সেই সাথে ইসলামকে ছিন্ন-ভিন্ন করা এবং এর মধ্যে বিদআত প্রবেশ করানো থেকে বিরত থাকি। এটা আলাদা কোনো বিধান নয়, বরং সবগুলো বিধানকে পরিপূর্ণভাবে পালন করার নির্দেশনা।

কুরবানির লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও বিধি-বিধান

জাভেদ আহমেদ গামিদি

কুরবানির উদ্দেশ্য আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। পশু কুরবানির মাধ্যমে আমরা আল্লাহর কাছে প্রতীকীভাবে এটা প্রমাণ করি যে, আমরা আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করেছি। আমরা নিজেদের প্রাণের বিনিময়ে পশু কুরবানি করার মাধ্যমে প্রতীকীভাবে এই কথার জানান দিই যে, আমরা আল্লাহর জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করতে সর্বদা প্রস্তুত। কুরবানির মাধ্যমে আমরা আল্লাহর প্রতি যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, তার মহান উদাহরণ হযরত ইবরাহিম (আ.) বহু আগেই পৃথিবীর মানুষের সামনে উপস্থাপন করেছেন।কুরবানি সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে:

لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ كَذَٰلِكَ
سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ

“আল্লাহর কাছে না এগুলোর মাংস পৌঁছায়, না এগুলোর রক্ত।বস্তুত তাঁর কাছে কেবল তোমাদের তাকওয়া পৌঁছায়। এভাবেই আল্লাহ এগুলোকে তোমাদের জন্য বশীভূত করেছেন যেন আল্লাহ তোমাদেরকে যে হেদায়েত দিয়েছেন, তার জন্য তোমরা আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণা করো। (এটা তাদের পথ, যারা উত্তম পন্থা অবলম্বন করে) আর (হে নবী), আপনি উত্তম পন্থা অবলম্বনকারীদের সুসংবাদ দেন।” (সুরা হজ্জ, ৩৭)

কুরবানির বিধি-বিধান

মুসলমানদের ইজমা ও তাওয়াতুরের মাধ্যমে কুরবানির যে বিধি-বিধান আমাদের কাছে পৌঁছেছে, তা নিম্নরূপ:

কুরবানি করতে হবে গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তু দিয়ে। যে প্রাণীকে কুরবানি করা হবে, সেই প্রাণী অবশ্যই শারীরিক ত্রুটিমুক্ত হবে। ঈদুল আজহা উপলক্ষে ১০ই জিলহজ ঈদের নামাজ আদায়ের পর পশু কুরবানি করতে হবে। সুরা হজ্জের ২৬ নম্বর আয়াতে এই বিষয়কে "أَيَّامٍ مَّعْلُوْمَاتٍ" (জ্ঞাত দিনসমূহ) হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। পারিভাষিক অর্থে এ দিনগুলোকে 'আইয়ামে তাশরিক' (তাশরিকের দিনসমূহ) বলা হয়। কুরবানির পাশাপাশি এই দিনগুলোতে আরও একটি সুন্নাত প্রচলিত রয়েছে এবং সেটি হচ্ছে: প্রত্যেক নামাজের জামাতের পর তাকবির ধ্বনি উচ্চারণ করা। নামাজের পর তাকবির বলার এই বিধান সাধারণভাবে দেয়া হয়েছে। শরীয়তে এর জন্য নির্দিষ্ট কোনো বাক্য বা শব্দ বাধ্যতামূলক করা হয়নি। কুরবানির গোশত মানুষ নিজেরাও কোনো দ্বিধা ছাড়াই খেতে পারে এবং অন্যদেরকেও খাওয়াতে পারে। কুরআন এই বিষয়ে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে:

فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ۚ

"(কুরবানি করার পর) যখন এগুলো কাত হয়ে পড়ে যাবে, তখন এগুলো থেকে তোমরা আহার করো, আর অল্পতে তুষ্ট দরিদ্র ও না পেরে যাঁচতে আসা দরিদ্রকেও আহার করাও।" (সুরা হজ্জ, ৩৬)

এগুলোই কুরবানির বিধি-বিধান। এছাড়াও রাসুল (সা.) কুরবানি সম্পর্কে বেশ কিছু নির্দেশনা দিয়েছেন, তা নিচে তা তুলে ধরা হলো:

- যারা কুরবানি করবেন, তাদের জন্য কুরবানির আগে নখ ও চুল কাটা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।[সহিহ মুসলিম: ৫১২১]

- কুরবানি অবশ্যই ঈদের নামাজের পরে করতে হবে।যদি ঈদের নামাজের আগে কুরবানি করা হয়, তবে সেটা সাধারণ পশু জবাই হিসেবে বিবেচিত হবে।[সহিহ বুখারি: ৫৫৬০-৫৫৬২, সহিহ মুসলিম: ৫০৬৪, ৫০৬৯, ৫০৭৯]

- উপযুক্ত বয়সের পশু দ্বারা কুরবানি করতে হবে। এক্ষেত্রে ছাগলের বয়স এক বছর, গরু বা ষাঁড় কমপক্ষে দুই বছর এবং উট কমপক্ষে পাঁচ বছরের হতে হবে। যদি উপযুক্ত বয়সের পশু না পাওয়া যায়, তবে এর থেকে কম বয়সের পশু কুরবানি করা যেতে পারে।[সহিহ মুসলিম: ৫০৮২, আবু দাউদ: ২৭৯৯, নাসায়ি: ৪৩৮৩]

- গরু, ষাঁড় বা উট কুরবানির ক্ষেত্রে একাধিক ব্যক্তি অংশগ্রহণ করতে পারবে। এমনকি সাতজন পর্যন্ত অংশগ্রহণ করলেও কোনো আপত্তি নেই।[সহিহ মুসলিম: ৩১৮৬] হাদিসে এসেছে, একটি উটের কুরবানিতে স্বয়ং রাসুল (সা.)-এর উপস্থিতিতে দশজন ব্যক্তি শরিক হয়েছিল এবং রাসুল (সা.) তাদেরকে নিষেধ করেননি ।[তিরমিজি: ১৫০১, নাসায়ি: ৪৩৯৭-৪৩৯৮]

- নফল ইবাদত হিসেবে ঈদুল আজহার বাইরে অন্য সময়েও কুরবানি করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, কোনো শিশুর জন্ম হলে রাসুল (সা.) নিজেও কুরবানি করেছেন এবং অন্যদেরও উৎসাহিত করেছেন। [সহিহ বুখারি: ৫৪৭২, আবু দাউদ: ২৮৪১]

খিলাফত

জাভেদ আহমেদ গামিদি

এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই ‘খিলাফত’ শব্দটি বহু শতাব্দী ধরে একটি পরিভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। কিন্তু ‘খিলাফত’ শব্দটি দ্বীনের কোনো পরিভাষা নয়। কোনো পরিভাষা রাজি, গাজালি, আল-মাওয়ারদি, ইবনে হাজম বা ইবনে খালদুন তৈরি করলে অথবা মুসলমানরা কোনো শব্দ নির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহার করলেই, তা দ্বীনের পরিভাষা হয়ে যায় না।

দ্বীনের পরিভাষা আল্লাহ এবং তাঁর রাসুল দ্বারা গঠিত হয় এবং তখনই গ্রহণযোগ্য হয়, যখন এর পারিভাষিক অর্থের পক্ষে কুরআন, হাদিস বা অন্যান্য ঐশী গ্রন্থের দলিল থাকে। নামাজ, রোজা, হজ ও উমরাহ ইত্যাদি দ্বীনের পরিভাষা, কারণ আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলগণ এ শব্দগুলোকে দ্বীনের পরিভাষার মর্যাদা দিয়েছেন। এছাড়াও বিভিন্ন স্থানে এগুলোকে পারিভাষিক অর্থে ব্যবহার করেছেন। পক্ষান্তরে খিলাফত শব্দটি আরবি ভাষার একটি সাধারণ শব্দ। যা প্রতিনিধিত্ব, উত্তরাধিকার এবং শাসন ও ক্ষমতা অর্থে ব্যবহৃত হয়। শব্দটি কুরআন ও হাদিসের সর্বত্র এই শাব্দিক অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

'খলিফা'এবং 'খিলাফত' শব্দ অপরিবর্তিত রেখে যে আয়াতগুলো অনুবাদ করা হয়েছে মানুষকে এ কথা বোঝানোর জন্য যে, এই শব্দগুলো নির্দিষ্ট পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, সেই আয়াতগুলোর অর্থ নির্ভরযোগ্য কুরআনের অনুবাদ এবং তাফসিরে দেখতে পারেন। তাহলে মূল বিষয়টি স্পষ্ট হবে এবং মন্তব্য করার মতো কোনো বাক্য আপনার নিকট থাকবে না। যেভাবে আমার একজন বিদ্বান সমালোচকেরও ছিল না। আমি এখানে দুইজন সম্মানিত আলেমের অনুবাদ তুলে ধরছি:

১. সুরা বাকারা, আয়াত নম্বর:৩০

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

"আর যখন তোমার রব ফেরেশতাদেরকে বললেন, আমাকে পৃথিবীতে নায়েব বানাতে হবে।" (শাহ আব্দুল কাদির)
"আর যখন তোমার রব ফেরেশতাদেরকে বললেন, আমি পৃথিবীতে নায়েব সৃষ্টি করতে যাচ্ছি।" (মওলানা মাহমুদ হাসান)

২. সুরা সোয়াদ, আয়াত নম্বর: ২৬

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ

"হে দাউদ, আমি তোমাকে পৃথিবীতে নায়েব বানিয়েছি, সুতরাং তুমি মানুষের মধ্যে ন্যায় বিচার করো।" (শাহ আবদুল কাদির)
"হে দাউদ, আমি তোমাকে পৃথিবীতে নায়েব বানিয়েছি, সুতরাং তুমি মানুষের মধ্যে ন্যায় বিচার করো।" (মওলানা মাহমুদ হাসান)

৩. সুরা নুর, আয়াত নম্বর: ৫৫

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ
فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ

"আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যারা তোমাদের মধ্যে ঈমান এনেছে এবং যারা সৎকর্ম করেছে, পরে তাদের শাসন ক্ষমতা দান করবেন। যেমন শাসন ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল তাদের পূর্বসূরীদের।" (শাহ আবদুল কাদির)
"আল্লাহ তাদের সাথে প্রতিশ্রুতি করেছেন, যারা তোমাদের মধ্যে বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে দেশের শাসন ক্ষমতা দেবেন, যেমন শাসন ক্ষমতা দিয়েছিলেন তাদের পূর্ববর্তী লোকদের।" (মওলানা মাহমুদ হাসান)

নায়েব এবং শাসক শব্দ দুটি এই আয়াতগুলোতে خَلِيْفَة ও اِسْتِخْلَاف শব্দের অনুবাদ হিসেবে এসেছে। সুতরাং এ কথা স্পষ্ট যে এই শব্দ দুটি দ্বীনের পরিভাষা নয়। যদি না কেউ এই কথা বলে যে, আরবি ভাষার প্রতিটি শব্দ, যা কুরআনে ব্যবহৃত হয়েছে, তা দ্বীনের পরিভাষা।হাদিস ও আসার ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য।

কেননা 'খিলাফত' এবং এ সম্পর্কিত সমস্ত শব্দ উপরে উল্লেখিত অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। এমনকি উত্তরাধিকারের অর্থে خَلِيْفَة শব্দটি আল্লাহতায়ালার জন্যও ব্যবহৃত হয়েছে।

এই কারণেই, 'সঠিক পথে পরিচালিত সরকার' বা 'নবুয়তের পথ অনুসারী সরকার' বোঝানোর জন্য খিলাফত শব্দটি যথেষ্ট নয়। বরং এর সাথে 'রাশিদা' এবং 'আলা মিনহাজিন নুবুওয়াহ'-এর মতো বাক্যাংশ যোগ করতে হয়। এ ধরনের অভিব্যক্তিকে অনুমান করে আলেমরা খিলাফত শব্দকে একটি পরিভাষা বানিয়েছেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে খিলাফত শব্দটি অবশ্য মুসলমানদের রাজনৈতিক ও সমাজবিজ্ঞানের একটি পরিভাষা হতে পারে, যেমন ফিকহ, কালাম, হাদিস ইত্যাদি।কিন্তু এটি দ্বীনের পরিভাষা নয়।এছাড়াও বলা হয়ে থাকে পৃথিবীতে মুসলমানদের একটি একক শাসন ব্যবস্থা থাকা উচিত এবং এটি ইসলামের হুকুম। এ বিষয়ে যেকোন জ্ঞানী ব্যক্তি, যিনি কুরআন সম্পর্কে অবহিত, তিনি জানেন যে, একথা কুরআন থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত নয়।

তবে এই দাবির পক্ষে দুটি হাদিস উপস্থাপন করা হয়।এর মধ্যে একটি হাদিস হলো, রাসুল (সা.) বলেছেন, বনি ইসরাইলকে নবীরা শাসন করতেন।অতঃপর যখন একজন নবী পৃথিবী থেকে চলে যেতেন, তখন অন্য একজন নবী তার স্থানে আসতেন। কিন্তু আমার পর আর কোনো নবী নেই, তবে শাসকরা থাকবেন, এবং তারা অনেক হবে।

প্রশ্ন করা হলো, তাদের সম্পর্কে আপনি আমাদের কী নির্দেশ দিবেন? রাসুল (সা.) বললেন, পূর্ববর্তী শাসকের সাথে আনুগত্যের চুক্তি পূর্ণ করো, এরপর তার পরবর্তী শাসকের সাথে।

দ্বিতীয় হাদিসটি হলো, যখন দুইজন শাসকের শপথ গ্রহণ করা হয়, তখন দ্বিতীয় শাসককে হত্যা করো।

দ্বিতীয় হাদিসের সনদ নিয়ে বিতর্ক রয়েছে।এরপরেও যদি এটাকে গ্রহণযোগ্য ধরা হয়, তবুও এই সত্যতা অস্বীকার করা সম্ভব নয় যে, এই হাদিসগুলিতে তা বলা হয়নি, যা এসব থেকে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

এখানে বলা হয়েছে, যদি মুসলমানরা তাদের রাষ্ট্র ব্যবস্থার জন্য কোনো ব্যক্তির হাতে শপথ গ্রহণ করে এবং এর পর যদি অন্য কেউ বিদ্রোহ করে ও মানুষকে শপথ গ্রহণের আহ্বান জানায় তাহলে প্রতিটি মুসলমানকে প্রথম শপথে অবিচল থাকতে হবে। তদুপরি, যদি দ্বিতীয় ব্যক্তি তার শাসনের ঘোষণা দেয় এবং কিছু মানুষ তার শপথ গ্রহণ করে, তবে তাকে হত্যা করতে হবে।এটি এমন একটি দিক নির্দেশনা, যা সকলের নিকট যৌক্তিক।

রাসুল (সা.)-এর দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার পর, যখন আনসারদের মধ্যে একজন এই প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে, আনসার এবং মুহাজিরদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন শাসক নিযুক্ত করা হোক, তখন হযরত ওমর (রা.) এই নীতি অনুযায়ী বলেছিলেন যে, এটা দুটি তলোয়ারের জন্য একটি খেলার মতো। হযরত আবু বকর (রা.) এ সময় মানুষকে সতর্ক করে বলেছিলেন, একটি সাম্রাজ্যে দুজন শাসক থাকতে পারে না। কারণ এর ফলে কঠোর বিরোধ সৃষ্টি হবে, সুস্থ সমাধানের বদলে বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পাবে এবং পুরো ব্যবস্থাপনা ভেঙে পড়বে।

এছাড়াও রাসুল (সা.) মানুষের মধ্যে যে ব্যবস্থা রেখে গিয়েছিলেন, তার পরিবর্তে একটি নতুন ব্যবস্থাপনা উদ্ভব হবে এবং অর্থাৎ একটি সাম্রাজ্যে দুইজন শাসক থাকবে। এই বর্ণনাগুলির যদি আল্লাহর রাসুল (সা.)-এর থেকে সঠিকভাবে প্রমাণিত হয়, তবে আপনি যা বলেছেন, তা ঠিক ছিল। কিন্তু এটা কোনো সঠিক যুক্তি হতে পারে না। ইসলাম যদি তার অনুসারীদের পৃথিবীতে একক রাষ্ট্র বা সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেয়, তাহলে আমেরিকা, ব্রিটেন বা পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে অধিকাংশ মানুষ ইসলাম গ্রহণ করলে এই হাদিস ও আয়াতের আলোকে তারা তাদের দেশে আলাদা সরকার প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন না। যদি করে তবে তারা পাপ করছে, যেমন বর্তমানে প্রায় পঞ্চাশটি দেশের মুসলমানরা করছে।

আলেমদেরকে সতর্ক থাকতে হবে যে, আল্লার দ্বীনে যা রয়েছে, তা ততটুকুই রাখা উচিত। কোনো আলিম, ফকিহ বা মুহাদ্দিসের এই অধিকার নেই তারা মানুষকে এমন নির্দেশ প্রদান করবে, যে নির্দেশ তাদের প্রতিপালক তাদেরকে দেননি।

আমি এ বিষয়ে লিখেছি এবং পুনরায় বলছি, যেসব দেশে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেখানে একটি সংযুক্ত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা আমাদের আকাঙ্ক্ষা হতে পারে। এজন্য আমরা সংগ্রামও করতে পারি। তবে এই ধারণার কোনো ভিত্তি নেই যে, এটি ইসলামের শরীয়তের বিধান যা লঙ্ঘন করলে মুসলমানদের পাপ হবে।

ইমাম বুখারির গ্রন্থ : ওহি নাকি ইতিহাস?

মুহাম্মদ হাসান ইলিয়াস

দলিল। হাদিস মূলত রাসুল (সা.)-এর জীবনচরিত, উত্তম আদর্শ, দ্বীনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, কুরআনের তাফসির, ইজতিহাদ এবং অন্যান্য ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে কেন্দ্র করে সংকলিত হয়েছে। সুতরাং অবশ্যই হাদিসকে কুরআনের আলোকে, যুক্তি ও জ্ঞানের ভিত্তিতে এবং মুহাদ্দিসগণের নির্ধারিত নীতিমালার আলোকে যাচাই-বাছাই করতে হবে। কোনো হাদিস নির্ভরযোগ্যতার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হলে তা অনুসরণ করা মুসলিমদের জন্য বাধ্যতামূলক, কারণ এটি কুরআনের নির্দেশ।তবে মনে রাখা জরুরি, কুরআনের মতো ইজমা ও তাওয়াতুরের ভিত্তিতে হাদিস আমাদের কাছে পৌঁছেনি। হাদিস আমাদের কাছে একক বর্ণনা (খবর-ই ওয়াহিদ) রূপে পৌঁছেছে। অতএব বুখারিসহ অন্যান্য হাদিসগ্রন্থ ওহির মতো দ্বীনের কোনো চূড়ান্ত উৎস নয়, এগুলো ঐতিহাসিক দলিল।

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও দার্শনিক জাভেদ আহমেদ গামিদি সহিহ বুখারির শিরোনামকে উদ্ধৃত করে বলেছেন যে, এই গ্রন্থের শিরোনামই প্রমাণ করে এটি একটি ইতিহাসের গ্রন্থ।

দক্ষিণ এশিয়ার আরেকজন বিশিষ্ট হাদিস বিশারদ মাওলানা মানাযির আহসান গিলানি (রহ.) সহিহ বুখারি সম্পর্কে তার গ্রন্থ 'তাদভিনে হাদিসে'-এর মধ্যে লিখেছেন:

"সত্যি বলতে, রাসুল (সা.)-এর যুগের মহত্তম, বিস্ময়কর ও বৈপ্লবিক ইতিহাসেরই নাম হাদিস।হাদিসশাস্ত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ ইমাম–ইমাম বুখারি তার গ্রন্থের যে নাম রেখেছেন, কেবল তার দিকেই লক্ষ করলেই আমি যা বলেছি, তা সহজেই বুঝতে পারবেন।যারা বোঝেন, তারা সবসময়ই এই বিদ্যাকে এমন দৃষ্টিভঙ্গিতেই দেখেছেন। ইমাম বুখারি তার গ্রন্থের নাম রেখেছেন: 'আল-জামি' আস-সহিহ আল-মুসনাদ আল-মুখতাসার মিন উমুরি রাসুলিল্লাহ (সা.) ওয়া আয়্যামিহি'–অর্থাৎ 'রাসুল (সা.)-এর বিষয়াবলি ও জীবনের দিনগুলোর উপর নির্ভর করে সংকলিত, সংক্ষিপ্ত সহিহ গ্রন্থ।"

অনেকে বলেন, সহিহ বুখারির কিছু পাণ্ডুলিপির শিরোনামে 'ওয়া সুনানিহি' শব্দটিও যুক্ত আছে। যার অর্থ দাঁড়ায় রাসুল (সা.)-এর সুন্নাতের বর্ণনা। সুতরাং সহিহ বুখারি কোনো ইতিহাসের গ্রন্থ নয়, বরং এটি সুন্নাতের একটি স্বতন্ত্র ও পূর্ণাঙ্গ সংকলন।তাদের এ কথা ঠিক যে, সহিহ বুখারির কিছু পাণ্ডুলিপির শিরোনামে 'ওয়া সুনানিহি' শব্দটি যুক্ত আছে। কিন্তু তাদের যুক্তি সঠিক নয়। কেননা সহিহ বুখারির প্রাচীন পাণ্ডুলিপিতে শিরোনাম বর্ণনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়।কিছু পাণ্ডুলিপিতে শিরোনাম হিসেবে 'রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর বিষয়াবলি ও দিনগুলি' ব্যবহৃত হয়েছে, আবার কিছু পাণ্ডুলিপিতে 'ওয়া সুনানিহি' (এবং তার সুন্নাতসমূহ) শব্দটিও যুক্ত রয়েছে।

এ ধরনের পার্থক্য প্রমাণ করে যে, এটি একটি ইতিহাসের গ্রন্থ।কারণ ইতিহাসের গ্রন্থ ব্যতীত এ ধরনের বৈচিত্র্য তৈরি হওয়া সম্ভব নয়।শিরোনামের এই বৈচিত্র্য এ গ্রন্থের ঐতিহাসিক বিকাশের একটি শক্তিশালী প্রমাণ বহন করছে। যাইহোক, যেসকল নির্ভরযোগ্য মুসলিম হাদিস বিশারদ সহিহ বুখারির পাণ্ডুলিপি সংকলন করেছেন তাদের কেউই 'ওয়া সুনানিহি' শব্দটি সহিহ বুখারির শিরোনামে যুক্ত করেননি।

যেমন, মুহাম্মাদ ইবনু ইউসুফ আল-ফারাবরি (মৃত্যু ৩২০ হিজরী), আবু যর আল-হেরভি (মৃত্যু ৪৩৪ হিজরী), ইবনু তাহির আল-মকদিসি (মৃত্যু ৫০৭ হিজরী), তারা সকলেই ছিলেন সহিহ বুখারির পাণ্ডুলিপি সংকলক এবং তারা কেউই 'ওয়া সুনানিহি' শব্দটি শিরোনামে যুক্ত করেননি। একইভাবে ইবনু খায়র আল-ইশবিলি (মৃত্যু ৫৭৫ হিজরী), যিনি সূচিবিশারদ হিসেবে খ্যাত, তিনি তার বইয়ের মধ্যে সহিহ বুখারির শিরোনামে 'ওয়া সুনানিহি' শব্দটি যুক্ত করেননি।

এছাড়াও 'ওয়া সুনানিহি' শব্দটি সহিহ বুখারির শিরোনামে যুক্ত থাকা কোনো জটিলতা তৈরি করে না। কেননা এই গ্রন্থের অভ্যন্তরীণ কাঠামো প্রমাণ করে যে, এটি একটি ঐতিহাসিক গ্রন্থ।তৎকালীন সময়ে ইতিহাসের গ্রন্থ এভাবেই সংকলিত হত।

এ সম্পর্কে ইমাম শাতিবি (রহ.) বলেন:

"ইতিহাস হলো সেই শাস্ত্র, যার মাধ্যমে পূর্ববর্তী জাতি, নবী এবং তাদের মতো অন্যান্য ব্যক্তিদের অবস্থা জানা যায়। তাদের ধর্মীয় ও দুনিয়াবি জীবনে কী কী ঘটনা ঘটেছিল তা জানা যায়। এতে মুতাওয়াতির ও আহাদ উভয় ধরনের খবরই অন্তর্ভুক্ত। কারণ এগুলি সবই ঘটে যাওয়া ঘটনার বর্ণনা।" (মুওয়াফাকাত, খণ্ড ২, কিতাবুল ইলম, পৃষ্ঠা: ৬০)

ইবনু খালদুন তার মুকাদ্দিমাতে লিখেছেন:

"হাদিস হলো রাসুল (সা.)-এর সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদ, যা সাহাবা, তাবেঈন এবং পরে বিভিন্ন শহরের আলেমরা বর্ণনা করেছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এটি ইতিহাসের বর্ণনার সংকলন।"

ইমাম খতিব বাগদাদি তাঁর 'আল-কিফায়াহ ফি ইলমির-রেওয়ায়াহ' গ্রন্থে লিখেছেন:

"যেসব খবর নবী (সা.)-এর থেকে বর্ণিত, সেগুলো বর্ণনা করতে হলে তদন্ত এবং সতর্কতার প্রয়োজন। কারণ এগুলি ধর্মীয় বিধি-বিধান এবং নবী (সা.)-এর সীরাতের ঐতিহাসিক দলিল।"

ইমাম ইবনু আবদুল বার হাদিস সম্পর্কে বলেছেন:

“আর যেসব আহাদ (একক) বর্ণনা (হাদিস) রয়েছে, সেগুলো অনুমানভিত্তিক, এগুলো নিশ্চিত জ্ঞান প্রদান করে না এবং এগুলোর উপর আমল করা বাধ্যতামূলক, তবে এগুলো থেকে নিশ্চিত জ্ঞান লাভ হয় না।” (তামহিদ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা: ২-৩)

সুতরাং আমাদের বিখ্যাত হাদিস বিশারদগণ বহু আগে থেকেই হাদিসগ্রন্থগুলোকে ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তারা এগুলোকে দ্বীনের চূড়ান্ত দলিল হিসেবে কুরআন ও সুন্নাতের উপরে প্রাধান্য দেননি। তারা আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন, অবশ্যই হাদিস অনুসরণ করতে হবে, তবে তা যাচাই-বাছাই করে এবং ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে; ওহি বা দ্বীনের অকাট্য উৎস হিসেবে নয়।

ইতমামে হুজ্জাত

জাভেদ আহমেদ গামিদি

এই পৃথিবীকে মূলত পরীক্ষার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। আর এই পরীক্ষার চূড়ান্ত পরিণতি হচ্ছে: কর্মের ভিত্তিতে মানুষকে পুরস্কার ও শাস্তি প্রদান করা। পুরস্কার ও শাস্তির জন্য আল্লাহতায়ালা কিয়ামতের দিন নির্ধারণ করেছেন। আল্লাহতায়ালা তাঁর নির্ধারিত কিয়ামত দিবসের অকাট্যতা প্রমাণের জন্য এই দুনিয়াতেই 'কিয়ামতে ছুগরা (قيامتصغرى)' বা ছোটো কিয়ামত প্রতিষ্ঠা করে দেখিয়েছেন, ঠিক যেভাবে বৈজ্ঞানিক কোনো বিষয়ের সত্যতা প্রমাণের জন্য সেটাকে পরীক্ষাগারে (laboratory) ফেলে প্রমাণ পেশ করাহয়।

এমনটি করার জন্য আল্লাহতায়ালা যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, তা এরুপ: তিনি যে জাতির কাছে চাইতেন তাঁর রাসুল পাঠাতেন এবং তাঁর রাসুল ঐ জাতির কাছে সত্যকে চূড়ান্তরূপে তুলে ধরতেন। সত্যকে এমন চূড়ান্তভাবে তুলে ধরাকে বলা হয় 'ইতমামে হুজ্জাত'।আল্লাহর রাসুলগণ নিজ নিজ জাতির নিকট সত্যকে চূড়ান্তরূপে তুলে ধরা তথা ইতমামে হুজ্জাতের কাজটি সম্পন্ন করতেন। এরপর পূর্ণইনসাফের সাথে ঐ জাতির ভাগ্য ফায়সালা এই পৃথিবীতেই করা হতো। এই ফায়সালা এভাবে বাস্তবায়িত হতো যে, যারা রাসুলের উপর ঈমান আনতো, তাদেরকে নাজাত দেয়া হতো এবং অস্বীকারকারীদের জন্য এই পৃথিবীতেই আল্লাহতায়ালার আজাব নাযিল হতো এবং রাসুলের অস্বীকারকারীদের জমিন থেকে চিরতরে মুছে দেয়া হতো অথবা তাদেরকে চিরস্থায়ী পরাধীনতার লাঞ্ছনাময় জীবনের শাস্তি প্রদান করা হতো।

পবিত্র কুরআনে হযরত নুহ (আ.)-এর জাতি, আদ ও সামুদ জাতি, হযরত লুত (আ.)-এর জাতি, এছাড়াও বিভিন্ন জাতির যেসব ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, তা এই শাস্তিরই বিবরণ।

কুরআনে বলা হয়েছে, রাসুলদের তরফ থেকে ‘ইতমামে হুজ্জাত’ সম্পন্ন না করা পর্যন্ত এই শাস্তি কখনোই কোনো জাতির উপরআসেনি।আল্লাহতায়ালা বলেন:

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

“আমি ততক্ষণ পর্যন্ত শাস্তি দেই না, যতক্ষণ না একজন রাসুল পাঠাই।” (সুরা বনি ইসরাইল, ১৫)

এখানে প্রশ্ন আসতে পারে, এই ইতমামে হুজ্জাত কীভাবে সম্পন্ন হয়? পবিত্র কুরআনের সুস্পষ্ট বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, ইতমামে হুজ্জাতের জন্য তিনটি বিষয় অত্যন্ত জরুরি।

- আল্লাহর রাসুল পৃথিবীতে উপস্থিত থাকবেন এবং তিনি কোনো জাতিকে তার উপর ঈমান আনতে আহ্বান জানাবেন।

- আহ্বানকৃত ঐ জাতিকে এই পরিমাণ অবকাশ দেয়া হবে যেন তারা রাসুলকে স্বচক্ষে দেখতে এবং তার মুখ থেকে আল্লাহতায়ালার পয়গাম সরাসরি শুনতে পারে।

ফার্সি স্তবক:

روے و آواز پیمبر معجزہ ست

পয়গাম্বরদের চেহারা ও কথা মুজেজা স্বরূপ।

- রাসুল এবং তার সঙ্গী-সাথিদের সাথে আল্লাহতায়ালার সম্পর্ক ও সাহায্যের বহিঃপ্রকাশ তাদের চোখের সামনে এমনভাবে ঘটবে যে, এই ব্যাপারে দ্বিতীয় কোনো মত প্রকাশের সুযোগ থাকবে না।

আল্লাহতায়ালা বলেন:

لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ

“যেন এই রাসুলদের সতর্ক করার পর মানুষের জন্য আল্লাহর সামনে কোনো ওজর পেশ করার সুযোগ না থাকে।” (সুরা নিসা, ১৬৫)

এরপরই অস্বীকারকারীদের উপর শাস্তি নেমে আসে।যদি রাসুল ও তার সঙ্গী-সাথিদের শক্তি ও সামর্থ্য থাকে, তাহলে অস্বীকারকারীদের উপর এই শাস্তি বাস্তবায়ন করা হয় রাসুলের অনুসারীদের মাধ্যমে; আর তাদের শক্তি ও সামর্থ্য না থাকলে ফেরেশতাদেরকে এই শাস্তি প্রদানের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে হুকুম দেয়া হয়। নবী মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহতায়ালার রাসুল ছিলেন এবং পৃথিবীর বুকে শেষবারের মতো এই কিয়ামতে ছুগরা বা ছোটো কিয়ামত ঘটানোর জন্য আল্লাহ তাকে পাঠিয়েছিলেন। তাই রাসুল (সা.)-এর পক্ষ থেকে ‘ইতমামে হুজ্জাত’ সম্পন্ন হওয়ার পর তার সাহাবিদেরও হুকুম দেয়া হয়েছিল তারা যেন রাসুল (সা.)-এর অস্বীকারকারীদের উপর আল্লাহতায়ালার শাস্তির এই ফায়সালা বাস্তবায়ন করে।

এই বিষয়ে পবিত্র কুরআনে আরবের মুশরিকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে:

فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ
وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ
وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“এরপর যখন হারাম মাসগুলো অতিবাহিত হবে, তখন তোমরা এসব মুশরিককে যেখানে পাও, সেখানে হত্যা করো, আর (এই উদ্দেশ্যে) তাদেরকে ধরো, তাদেরকেঘেরাও করো এবং প্রত্যেক ওঁৎ পাতার জায়গায় তাদের জন্য ওঁৎ পেতে বসে থাকো। এরপর তারা যদি তাওবা করে, আর যত্ন সহকারে নামাজ পড়তে শুরু করে এবং যাকাত দেয়, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও।নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, সদাদয়ালু।” (সুরা তওবা, ৫)

একইভাবে আরবের আহলে কিতাবদের সম্পর্কে বলা হয়েছে:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

"ঐসব আহলে কিতাবির সাথেও তোমরা যুদ্ধ করো, যারা আল্লাহর প্রতিও ঈমান আনে না এবং পরকালের প্রতিও ঈমান আনে না।আর আল্লাহ যা হারাম সাব্যস্ত করেছেন, তা হারাম মনে করে না এবং সত্য দ্বীনকে নিজের দ্বীন বানায় না, (এদের সাথে যুদ্ধ করো) যতক্ষণ না তারা নিজ হাতে কর দেয় এবং অধীনস্থ হয়।" (সুরা তওবা, ২৯)

এসব আয়াতের প্রসঙ্গ, প্রেক্ষাপট ও পূর্বাপর যোগসূত্রের আলোকে এটা স্পষ্ট যে, এই হুকুম মূলত আরবের মুশরিক ও আহলে কিতাবদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। কিন্তু আমরা দেখতে পাই রাসুল (সা.)-এর সাহাবিদের মধ্যে যারা তার উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন, তারা আরব উপদ্বীপের বাইরের কিছু জাতির সাথে এই একই কাজ করেছিলেন। এটা স্পষ্টতই একটি ইজতিহাদি সিদ্ধান্ত ছিল, যাকে ভুল অথবা সঠিক বলা যেতে পারে। তবে আমার মতে সাহাবায়ে কেরাম (রা)-দের এই ফায়সালা সম্পূর্ণ ঠিক ছিল। এর প্রমাণ হচ্ছে: রাসুলের পক্ষ থেকে কোনো জাতির উপর 'ইতমামে হুজ্জাত' সম্পন্ন হওয়ার জন্য যেসব শর্ত উপরে বর্ণিত হয়েছে, সেসব শর্ত এই জাতিগুলোর ক্ষেত্রে সবদিক থেকে পূরণ হয়েছিল।কীভাবে তা হয়েছিল, তার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ:

- রাসুল (সা.) জীবিত থাকা অবস্থায় তার বার্তাবাহক প্রেরণ করে এই সকল জাতিকে ইসলামের দিকে আহ্বান করেছিলেন। রিসালাতের যুগের ইতিহাস সম্পর্কে অবগত প্রত্যেকটি ব্যক্তি জানেন রাসুল (সা.) ঐ সকল জাতির শাসকদেরকে চিঠির মাধ্যমে অবগত করেছিলেন। বলেছিলেন তিনি আল্লাহতায়ালার রাসুল এবং তার পক্ষ থেকে ইসলামের দাওয়াত পৌছাবার পর দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের নিরাপত্তার জন্য কেবলমাত্র ইসলাম গ্রহণ করা ছাড়া ভিন্ন কোনো পথ নেই।

রাসুল (সা.) এসকল চিঠি আবিসিনিয়ার রাজা নাজ্জাশি, মিশরের রাজা মাকওয়াকাস, পারস্যের রাজা খসরু পারভেজ, রোমের রাজা হেরাক্লিয়াস, বাহারাইনের রাজা মুনযির বিন সাবি, ইয়ামামার শাসক হাওযা বিন আলি, দামেস্কের রাজা হারিস বিন আবি শামার এবং ওমানের রাজা জায়ফরের কাছে লিখেছিলেন। এসকল রাজা-বাদশাদের কাছে লিখিত চিঠিগুলোর বক্তব্যের মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। আমি এখানে রোমের রাজা হেরাক্লিয়াসের প্রতি রাসুল (সা.) কর্তৃক লিখিত চিঠিটি উল্লেখ করছি।এর মাধ্যমে পাঠক বুঝতে পারবেন এসকল চিঠি কেমন বাকশৈলী, কতটা উচ্চতা ও মনোবলনিয়ে লেখা হয়েছিল।রাসুল (সা.) লিখেছেন:

“পরম করুণাময় সদা দয়ালু আল্লাহর নামে। আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসুল মুহাম্মদের পক্ষ থেকে রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াসের প্রতি।

যে হেদায়েতের অনুসরণ করে, তার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। অতঃপর আমি তোমাকে ইসলাম গ্রহণের জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। তুমি ইসলাম গ্রহণ করে নাও, তাতেনিরাপদ থাকবে। আল্লাহ তোমাকে দ্বিগুণ প্রতিদান দেবেন। আর যদি তুমি বিমুখ হও, তাহলে তোমার প্রজাদের পাপের দায়ও তোমার উপর বর্তাবে।

হে আহলে কিতাব! এমন একটি কথার দিকে আসো, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সমান; আর তা হচ্ছে: আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও উপাসনা করব না, তাঁর সঙ্গে কাউকে শরিক করব না,আর আমাদের মধ্যে একজন অপরজনকে আল্লাহকে বাদ দিয়ে প্রভু বানাব না।এরপর যদি তারা বিমুখ হয়, তাহলে তোমরা বলে দাও: ‘সাক্ষী থাক - আমরা মুসলমান।’” (সহিহ বুখারি, হাদিস নম্বর: ৭)

- এসমস্ত চিঠি রাসুল (সা.) হুদায়বিয়া থেকে ফিরে এসে ৭ হিজরির মুহাররম মাসে লিখেছিলেন। এ চিঠিগুলো লেখার পর রাসুল (সা.) কম-বেশি চার বছর পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।এমনকি এই সময় তিনি তাবুক সফর করেছিলেন, যা রোম সম্রাটের পক্ষ থেকে কোনো একটি আক্রমণের আশঙ্কায় করা হয়েছিল।এটা কম সময় নয়। ঐ সকল জাতির লোক এবং তাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ যদি ইচ্ছে করতেন, তাহলে রাসুল (সা.) -এর সাথে সাক্ষাৎ করতে পারতেন এবং আল্লাহতায়ালার জমিনের উপর তাঁর সর্বশেষ পয়গাম্বরকে স্বচক্ষে দেখতে পারতেন।

- রাসুল (সা.) এবং তার সাহাবা (রা.)-দের সাথে আল্লাহতায়ালার সম্পর্ক ও সাহায্যের বহিঃপ্রকাশ বদর, ওহুদ, আহজাব ও খায়বারের যুদ্ধে আরবের মুশরিক ওআহলে কিতাবদের সামনে ঘটেছিল। যার ফলে তাদের জন্য শাস্তির ফয়সালা ঘোষণা করা হয়েছিল। রাসুল ও তার সাহাবিদের সাথে আল্লাহর এ সম্পর্ক ও সাহায্যের বহিঃপ্রকাশ ঐসব জাতির জন্যও প্রকাশ পেয়েছিল, যখন কুরআনের সুস্পষ্ট ভবিষ্যৎবাণী অনুযায়ী মক্কার কুরাইশরা তাদের সমস্ত শক্তি ও সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও মুসলমানদের কাছে পরাজিত হয়। কুরাইশ নেতাদেরকে শাস্তি দেয়া হয়। মুসলমানরা মক্কা বিজয় করে নেয়। আল্লাহতায়ালার গৃহের তত্ত্বাবধান কুরাইশদের থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়। আরবের লোকেরা দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করতে শুরু করে। দ্বীন-ইসলাম বিজয় লাভ করে। আল্লাহর শরিয়া প্রতিষ্ঠিত হয় এবং দ্বিতীয় কোনো ধর্মেরকর্তৃত্ব আরব ভূখণ্ডে অবশিষ্টথাকেনি। শুধু তাই নয়,আরব ভূখণ্ডের বাইরের এসব জাতির বিরুদ্ধে যখন অভিযান শুরু করা হয়, তখন তাদের রাজ্যগুলো বালুকারাশির মতো বিক্ষিপ্ত হয়েবাতাসে উড়ে যায়। ঐসকল জাতির শাসকদের বলে দেয়া হয়েছিল যে, রাসুল (সা.)-এর তরফ থেকে যখন ইতমামে হুজ্জাত সম্পন্ন হবে, তখন তাদেরকে অবশ্যই অধীনস্থ হয়ে থাকতে হবে, অন্যথায় আল্লাহর জমিনে তাদের শাসনকর্তৃত্ব থাকতে পারে না। এসমস্ত বিষয় ইতিহাসের প্রতিষ্ঠিত ঘটনা, যা ঐসকল জাতির লোকদের চোখের সামনে ঘটেছিল। সাহাবায়ে কেরাম (রা.) যা করেছেন, তা এসব বিষয়ের ভিত্তিতেই করেছেন। তারা ঐসব জাতির লোকদের দাওয়াত দেয়ার সময় অবশ্যই এসব বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকবেন। সাহাবায়ে কেরাম (রা)-এর প্রতি এই ভুল ধারণা পোষণ করা উচিত হবে না যে, তারা এসব বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিআকর্ষণ না করেই কেনো ব্যক্তি বা জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেছিলেন।

গজল

জাভেদ আহমেদ গামিদি

اشہد ان لا الہ

আশহাদু আল লা ইলাহা

میری نوا کا ثبات، اشہد ان لا الہ

মেরি নোয়া কা সবাত, আশহাদু আল লা ইলাহা।
আমার সুরের স্থিরতা, আশহাদু আল লা ইলাহা।

قلب و نظر کی حیات، اشہد ان لا الہ

কলব ও নজর কী হায়াত, আশহাদু আল লা ইলাহা।
হৃদয় ও দৃষ্টির হায়াত, আশহাদু আল লা ইলাহা।

عالم نو ہے مگر آج بھی ہوں نغمہ زن توڑ کے لات و منات
اشھد ان لا الہ

আলমে নও হে মাগার আজ ভী হুঁ নঘ্মা-যন,
তোর কেলাত ও মানাত, আশহাদু আল লা ইলাহা।
নয়া জামানা, তবু আজো আমি গেয়েছি গান,
চূর্ণ করে লাত ও মানাত, আশহাদু আল লা ইলাহা।

شوکت فغفور و کے، سلطنت روم ورے موت ہے
اس کی برات، اشھد ان لا الہ

শওকতে ফাগফুরোকে সালতানাতে রোমোরে মওত হে উসকি
বারাত, আশহাদু আল লা ইলাহা।
ফাগফুর ও রোমের শৌর্য, সাম্রাজ্যের ঔদ্ধত্য
মৃত্যুই তার মুক্তিপত্র, আশহাদু আল লা ইলাহা।

تو ہے مسلماں تو ہیں ایک ہی دریا کی موج دجلہ
و نیل و فرات، اشھد ان لا الہ

তু হে মুসলমাঁ তু হি দরিয়া কি মোজ দজলা ও নীল ও ফুরাত,
আশহাদু আল লা ইলাহা।
মুসলিম তোমরা, তোমরা একই নদীর তরঙ্গ;
দজলা, নীল ও ফুরাত, আশহাদু আল লা ইলাহা।

গজল

پھر وہ اذان سحر، ڈھونڈ رہی ہے جسے تیرے
شبستاں کی رات، اشہد ان لا الہ

ফের ওহ আজানে সাহার, ঢুনঢ রাহি হে জিসে তেরে শাবিসতাঁ কি
রাত, আশহাদু আল লা ইলাহা।
ফের সেই ফজরের আজান, যা খুঁজছে
তোমার রাতের অন্ধকার, আশহাদু আল লা ইলাহা।

علم و ہنر کا فسوں، عشق کا زور جنوں بندۂ حق کی نجات، اشہد ان لا الہ

ইলম ও হুনার কা ফাসোঁ, ইশক কা জোর জুনুনে বান্দা হক কা
নাজাত, আশহাদু আল লা ইলাহা।
জ্ঞান ও শিল্পের জাদু, প্রেমের শক্তি
বান্দার মুক্তি, আশহাদু আল লা ইলাহা।

درد کا درماں بھی یہ عشرت دوراں بھی یہ تلخی غم میں نبات، اشہد ان لا اللہ

দরদ কা দরমাঁ ভি ইয়েহ আশরাতে দোরাঁ ভি ইয়েহ তালখি গম
মে নাবাত, আশহাদু আল লা ইলাহা।
ব্যথার চিকিৎসাও এটা, আনন্দের সময়ও এটা, দুঃখের
তিক্ততায়ও এটা, আশহাদু আল লা ইলাহা।